সিংহাসন, তুমি কার

সিংহাসন, তুমি কার

বরুণ চৌধুরী

নবপত্র প্রকাশন কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৬২
প্রকাশক
প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলকাতা-৯
মুদ্রক
সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ মনোমোহন বসু স্ট্রিট / কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ
শ্যামল সেন

SIMHASAN, TUMI KAAR
By
BARUN CHOWDHURY
Nabapatra Prakashan
8 Patuatola Lane
Calcutta-700 009

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে

দেশলাইয়ের শেষ কাঠি জ্বালা কার জন্যে ?

সিংহাসন, তুমি কার

ছোট্ট আঁটসাঁট তেঁতুল গাছটায় চড়ে বিশু সমানে ডাল ঝাঁকাচ্ছে। পাকা তেঁতুল পড়ছে টপাটপ আর পাতায় একটানা ঝিম-ঝিম শব্দ ঠিক দূরের বৃষ্টির মতো। বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় সেখানেও ঝাপসা বৃষ্টির মতো শেষ ফাগুনের কচি বাঁশপাতা। অথচ চৌদিকে বড্ড তেজী ডালকুত্তা রোদ। হারাধন ভরদুপুরে একা একা হাঁটু গেড়ে খামকা ঢাক পেটায়। আর কোনো ঢাকী নেই। যৌবন গেলে কি হয়, চেহারাটা এক ছটাক টসকায় নি। বিরাট শরীরটায় এমন একটা রোদপোড়া চণ্ডাল রাগ মাখানো যে চোখে চোখে তাকাতে ভয় ধরে। চোখের তারার আধখানা ওপরের পাতার তলায় সেঁধিয়ে থাকে, জেগে থাকে অনেকখানি শাদা। মানুষজনের অর্ধেক কথার ভালোমতো উত্তরই দেয় না। মস্ত ঝাঁকড়া মাথাটায় কি যে গুনগুনায় সে নিজেই জানে। বাচ্চারা ছাড়া কেউ বড় একটা হারাধনের কাছে ঘেঁষে না। ওকে ঘিরে আদুল গায়ে ঘণ্টু, ভোমলি আর বুবাই এক নিবিষ্টে ঢাকে কাঠি মারা শিখছে। ঘণ্টুটা বেশি চনমনে। আচমকা দুম করে ঢাকে মেরেছে এক চাঁটি। হারাধনও ধাঁ করে এক চড়—

কতোদিন বলিচি উদিকটায় চাঁটি মারতে নেই, কড়া দিকে চাঁটি দিবি তা গেরাজ্যি নেই। চামড়া ফেটে গেলে এখনি শালা পাঁচটা টাকা গলে যাবে তখন ?

কেউ আর রা কাড়ে না। হারাধন শুধু নিজের খেয়ালে বার কয় ডুড়ুং ডুড়ুং করে। কোমরের গামছা খুলে গলার আর বগলের ঘাম মোছে তার পর ফের একখানা ডুড়ুং ডুড়ুং। খাঁ খাঁ নিঃসাড় ফাগুনের ভরা দুপুরটা ঢাকের শব্দে, অর্চনা বৃষ্টি মাৎসর্যে কেমন দুর্গাপুজোর গমগমে বিকেল হয়ে যায়।

আসলে ঢাক পেটানো হারাধনের কাজ নয়। কুমীরছড়ার বাবুরা হারুর বাবাকে মাসে তিনটে করে টাকা দিত। রোজদিন পীরের দরগায় ঢাক বাজাবার জন্যে। বাপ মরতে কাজটা হারুর ঘাড়ে চাপে। এখন অবশ্য তিন টাকা বেড়ে মাসে আট টাকায় দাঁড়িয়েছে। তবু মন ওঠে না হারুর। ছোট থাকতেই বেশ পাকা হাতে কাঠি চালাত হারু। কিন্তু কাঠি ছোঁবে না যে কিরে করেছে তাকে বোঝাবে কে। আগে মার্টিন রেল ছিল, দিব্যি ছাপাখানার

রোয়াক থেকে সটান রেলকামরায় ঝুলে পড়া যেত। এখন শালা লাইন পড়ে আছে, রেল নেই। তাই বা কই। লাইনকে লাইন খুলে কলকাতায় মানিকতলার কালোয়ারদের বেচে অনেকেই দু পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। স্রেফ আটটা টাকার লোভে হারু কখনোই গতর নাড়াতো না। নেহাত বউটা চোপরদিন কাঁ কাঁ করে তাই। মাস গেলে আট আটটা টাকা তাই বা দিচ্ছে কে তোমার মতো কুঁড়ের বেহদ্দকে। হারুরও যেন খেয়েদেয়ে কাজ নেই ভরদুপুরে ঝুটমুট একা একা ডুডুং ডুডুং করে। পলকাটা ছোট ছোট পেতলের রেকাবিতে একমুঠো আতপচাল আর দুটি চিনির বাতাসা নিয়ে পীরের পুজো দিতে আসে বুলা, খুশি, কোকিল ওরা সবাই। এই চালটা বাতাসাটা হারুর উপরি পাওনা। এই মেয়েগুলোকে সে ফ্রক পরা অথবা আদুল গায়েও দেখেছে সেই কতটুকু বয়েস থেকে। আজকাল কোকিলটা শাড়ি ধরেছে। শরীরটা ভোরের গঙ্গা ফড়িংয়ের মতো উড়ুউড়ু সবুজ। মনটা বড্ড সাদা। বর জুটছে না বলে বাড়িতে নিত্য মায়ের বকা খায়। এক একদিন রেগে গেলে চোখটা ছাড়ানো লিচুর মতো ঝাপসা দৃষ্টিশূন্য লাগে।

হারাধনের হাত থেকে ঢাকের কাঠি ছোঁ মেরে আচমকা তার গলা জড়িয়ে বলে, ধ্যাৎ চল তোমাদের বাড়ি পালিয়ে যাই আর কক্‌খনো আসবো না। হারাধনের মেয়ে দোপাটি বেঁচে থাকলে সে মুখপুড়িটাও হয়তো এতদিনে শাড়ি পরত। ভরা আশ্বিনে দোপাটি ফুল ফোটার সময় জয়াব গর্ভে এসেছিল। আট বছরের ছোট্ট মাথা দুলিয়ে যখন হারুর আদুল ভুঁড়িতে কচি আঙুলে তবলা বাজিয়ে বলত 'পেট পড়ে গেছে খেতে চল', হারাধন তখন ওর মাথায় নাক ঘষে বাইরে বিকেলের ঠাণ্ডা আলো দেখত, ভাবত তার হাতের কাজের কদর এ বুড়িটা ছাড়া তো আর কেউ দেয় না।. .পেছনে চাটুজ্যে বাগানে একসার সবুজ দোপাটি গাছের তলাটা অজস্র ঝরা দোপাটির কিচ্ছু না হারানো গোলাপী দুঃখে থৈ থৈ, তাতে আসন্ন হেমন্তের হিম শিশুকণ্ঠের কলরব হাত ধরাধরি করে গোল জলবৃত্তের মতো ক্রমে বড় হতে হতে কতদূরে হারিয়ে যায়। আজ হঠাৎ হারাধনের মনে হয় মেয়েটার নাম দোপাটি না রাখলেই বোধ হয় ভালো ছিল।

প্রায় তিনসপ্তা পর নিজের কোটর ছেড়ে একটু বেরিয়েছে হারাধন। পুরনো খাটিয়াটা নিমতলায় টেনে নিজের বিরাট বপুটা তাতে ছেড়ে দিয়ে দিব্যি সুখটান দিচ্ছে সিগারেটে। দাঁত মাজে নি, নাকি গতরাতের পানের ছোবে দাঁত লাল। চুলেও তেমন তেলজল নেই। তালপাতার মতো মাথার চুল

টোকা কর। খাটিয়া থেকে ঠ্যাংটা বাইরে ঝুলছে আর ঝুলন্ত পায়ের বুড়ো আঙুলে একখণ্ড বাঁকা চাঁদের মতো নীল নোখ গাঁথা। খাটিয়ার পায়ায় বাঁধা ওর আসঙ্গী বেজিটা। পাতলা ধারালো দাঁত বের করে এমন খ্যাকখ্যাক করে তেড়ে আসে যে খাটিয়ার কাছে ঘেঁষে কার সাধ্যি। কেউ আসুক বা না-আসুক এমন হুড়মুড় করে একনাগাড়ে ছুটোছুটি করে যে গলায় টান না পড়লে থামেই না। ছোলার ছিবড়ে আর পেঁয়াজের শুকনো খোলায় ছত্রাকার একটা প্রচণ্ড গরমে পোড়া বিকেল খাটিয়ার তলায় বিছানো। আগে আগে এখানে খাটিয়া পাতার জো ছিল না। ছোট লাইনে মার্টিন রেল, উঠোনের গা-বেয়ে সর্বক্ষণ ঝিকঝিক ঝিকঝিক। সোজা চাঁপাডাঙ্গা হয়ে শিয়াখালা। আর ওদিকে একেবারে চণ্ডীতলা হয়ে ডানকুনি তার পর তো নতুন হাইওয়ে। বাসে বালি ব্রিজ ফুড়ুৎ। তখন চারদিকেই গমগমে বাজার। তবে সোলার পুতুল, ফল আর ময়ূর এখন আর তেমন বানায় না হারাধন। ফালতু পয়সার ধান্দা-বাজিতে আর মন ওঠে না। সারা বছর ধরে দুর্গার অল্পস্বল্প ডাকের সাজ, কলকাতার আর্টিস্টের ডিজাইন মাফিক ঘর সাজাবার দু-চারটে টুকিটাকি ছাড়া সোলার কাজ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে হারাধন। এখন খুব জমিয়ে শুরু করেছে বেতের কাজ। গোটা পাঁচ-দশ মোড়া বানায়, শনি মঙ্গলে মশাটের হাটে দিব্যি কেটে যায়। কিন্তু কি যে মাথায় ঢুকেছে এখন ঐসব কিছু ছেড়েছুড়ে মস্ত উঁচু এক বেতের সিংহাসন ধরেছে, তাতে নানা ফুলতার সূক্ষ্ম কারুকাজ। আর সেইজন্যেই জয়ার যত গায়ের জ্বালা। যত সব বদ খেয়াল, কে কিনছে তোমার ঐ রাবণরাজার সিংহাসন।

খ্যাখো বেশি ফুট কেটো না।

হারুর লাল চোখের দিকে তাকিয়ে ওর চাউনিটা কেমন স্বাভাবিক মনে হয় না জয়ার। অবশ্য মানুষটা কবেই বা সহজ? চিরদিনই কাট গোঁয়ার। তবু একটু আদুরে টানে মন ভেজাবার তালে জয়া বলে, বল না গো, সত্যিই কেউ কিনবে। কত টাকা পাবে? ওর কানের লতিতে একটা টান দিয়ে তাতে আলতো দাঁত বসিয়ে হারাধন বলে, কলকাতার একটা যাত্রাপার্টির অর্ডারী মাল, বায়নার টাকা ওরা কালই দিয়ে যাবে।

অনেকটা গরম রসে সদ্য খোলা থেকে নামানো রাজভোগের মতো জয়ার চোখ ফুলে ফেঁপে ঢোল। মেয়েমানুষ শালা টাকার গন্ধ পেলে একেবারে ওলটানো শুবরে পোকা। তাও ভালো করে একবার দেখল না পর্যন্ত হাতের কাজটা। বাচ্চাগুলো ছাড়া পাড়ার সবাই এড়িয়ে চলে হারাধনকে। আর

বিকেল হলেই বাচ্চাগুলো ঠিক ঝাঁক বেঁধে ভিড় করবেই ওর জানলায়। কাজ করতে করতে পিঠে মাছি বসলে যে ভাবে টের পাওয়া যায়, হারাধনও সেইভাবেই টের পেত পিঠের ওপর একগাদা বাচ্চার চোখ। বিরাট উঁচু এই সিংহাসনটার কাজ যত শেষ হয়ে আসছে ততই যেন হারাধনের বুকে একটা ব্যথা উঠছে। এর পর তো সবই ফাঁকা। অনেকদিন একটা কাজের মধ্যে বাঁচতে বাঁচতে আসল বাঁচাটা কেমন খেলো হয়ে যায়। তাই সে কাণ্ডটা শেষ করতে বুকে একটা খিঁচ ধরে। কেমন একটা ধুকপুকুনি। বাপ মারা যাওয়ার পরেও এমনি কঠিন একটা খিঁচ ধরত পথেঘাটে। সারা বুক আড়ষ্ট। মরার সময়ও মানুষটা একবার বলল না কোথায় কষ্ট। অজ্ঞান মেঘ-নীলিমা থেকে ভেসে আসা বারবার একই উত্তর: 'আমার কোনো কষ্ট নেই বেশ আছি।' হারাধন এখনো রোজই ভাবে মরার সময় সত্যিই কি মানুষের কোনো কষ্ট থাকে না, সত্যিই কি শরীরে 'বেশ আছি' ভাব আসে? নিজের গেঞ্জিতে এখনো বাপের ধানজমি, নানা কষ্টের ছেঁড়া ঘাসের কাঁচি, শ্লেষ্মা জড়ানো কণ্ঠস্বরে আগলে রাখা প্রিয় ফুলের মতো পীতাভা...! পুরনো গেঞ্জিতে কিছুতে নতুন শাদা আসে না, কাচতে কাচতে কেমন একটা কালো-হলুদ ছোপ। জলেরও নিজস্ব ক্লান্তি থাকে, বহমান বলে তা ধরা পড়ে না, শুধু জীবনে তার ছোপ লেগে থাকে। আর মোটে এক সপ্তা বাকি। সোমবার ওরা কিনে নেবে সিংহাসন।

দিনটা ছিল মঙ্গল। এ-সপ্তায়ও হাটে যায় নি, হারাধন। ট্যাঁকে আগের কিছু মোড়া বিক্রির টাকা ছাড়া সিংহাসনের বায়নার একটা মোটা টাকা। শেষের দিকে সিংহাসনটা আর ঘরে কুলাতো না। আড়াআড়ি করে রাখার ফলে দরজা ছাপিয়ে রাস্তায় উঁকি দিত। আজ অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ওটাকে ঘর থেকে বার করেছে হারাধন। দোরের সামনে উঠোন নেই, ফুটপাথও না। ফলে একেবারে উদোম রাস্তার গোটা রাস্তা আলো করে বিশাল মহিমময় এক সিংহাসন। ওপরে শেষ চৈত্রের বুকের ছাতি-ফোলানো আকাশ, বেলা সাতটার রোদে দশটা কেঁদো বাঘের বিক্রম। পথ দিয়ে যে যায় থমকে দাঁড়ায়। সাত সকালেই কুঁচো ছেলেমেয়েগুলোর ভিড়। বুলা, খুশি ওরাও এসেছে, শুধু কোকিলটা নেই। নিমতলায় যথারীতি হারাধনের খাটিয়া পড়েছে। পায়ার সঙ্গে লোহার চেনে-বাঁধা বেজিটা বাঁশির সুরের মতো কিলবিল করছে। সিমেন্টের ভুঁয়ে লোহার চেন-ঠোকা বিচিত্র আওয়াজ উঠছে। আজ হারাধন শুয়ে নেই। দিব্যি চানকরা চুলে চিরুনি দিয়েছে, পাটে পাটে বসানো চুল। সদ্য কামানো মুখে ফরসা গেঞ্জির শাদা আভা। কোলের কাছে বসা জয়ার লম্বা

চুলে নিজের মোটা মোটা আঙুল ডুবিয়ে মেথি মেশা নারকোল তেল মাখাচ্ছে। জয়া চন্দনা গলায় খুশির শিস দেয়,

কি দারুণ হয়েছে গো সিংহাসনটা। দেখো তুমি ঠিক সোয়া শো টাকা দাম পাবে। আগে থেকে বলে রাখছি একটা ভালো রেডিও কিন্তু এবার কিনতেই হবে।

হারাধন খুব ভালোই জানে টাকা ওর বেশি বই কম পাবে না। তবু সাক্ষাৎ কারণেই তা চেপে যায়, দূর পাগলী টাকা কি গাছে ফলে।

হারুর মেজাজটা আজ তিরিক্কে নয় বলেই জয়ার সাহস বাড়ে, সে একটা উলটো ফুসমন্তর ঝাড়ার তাল করে।

একটা কথা বলব রাগ করবে না বলো ?

উত্তরে পিঠে ছোট একটা কিল হজম করে ভয়ে ভয়ে ফিরে বসে, হারুর দিকে নিজের চোখের বাদাম খুলে ধরে। ছ্যাখে সে চোখেও মোমের পর্দার আড়ালে গাঢ় সোনালী মধুরানী মৌমাছির ঘরে-ফেরা ভোর। অভয় পাওয়া জয়া তবু খানিক মেঘলা গলায় বলে,

কাল মেজমামা এসেছিলেন। তুমি কাজে ব্যস্ত ছিলে তাই ডাকি নি। উঁকি মেরে সিংহাসনটা দেখে খুব পছন্দ। তোমার হাতের কাজেরও অনেক প্রশংসা করল। ছেলের বিয়ে দিচ্ছে। রুপোর রেকাব দিয়ে আত্মীয় নেমতন্ন করবে বললে। বড় ইচ্ছে বউ-ভাতের দিন বউ বসাবেন ঐ সিংহাসনটায়। অমন সিংহাসন নাকি এ তল্লাটে কেউ ছ্যাখে নি। অনেক গন্যিমান্যি লোক আসবে তো। দেখবে চারিদিকে তোমার ধন্যি পড়ে যাবে। আর হাতে হাতে একশোটা টাকা দিতে চাইছিলেন, আমি নিলাম না। যাবার সময় বললে, হারুর হাতের কাজ তো ভালোই, তবে দিনকাল যা পড়েছে, ওতে কি সংসার চলে। ওর ওষুধ দোকানের কম্পাওার বিষ্টু চাকরি ছেড়ে কয়লার ডিপো দিয়েছে। তোমাকে ঐ কাজটা দিতে পারে। তিরিশ টাকা অবধি মাইনে দিতেও রাজি।

এত কথার পর ছোট্ট এক টিপ নস্যির মতো হারুর এক ফুঁয়ে সব উড়ে গেল।

কে তোমার মেজমামু ? চণ্ডীতলার ঐ ওষুধের দোকানের শয়তান প্যালা মণ্ডল ? শালা জল মিশিয়ে মিকচার বেচে তিনতলা বাড়ি হাঁকিয়েছে। এক পয়সার পাস না দিয়ে ধন্বন্তরি ডাক্তার হয়েছেন আর সেই দেমাকে শালা আমার বন্ধু শংকর ডাক্তারের ওপর টেক্কা মারতে চায়। আরে ম্যাড়া,

শংকর যে এম-বি পাশ আর তুই শালা একটা খাসি হয়ে—। মাইরি বউ, এ মাল যে কি করে তোমার মামু হয় বুঝি না।

রাগী বাঁটুলের মতো ঠিকরে বেরিয়ে যায় জয়া। কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে শুধু নষ্ট টোপাকুলের বিচির মতো একটা শব্দ থু করে দেয়—ছোটলোক।

কি রে হোরা যে—

ডাকটা শুনেই হারাধনের মাথায় চিড়িক মারে। জ্ঞাতি সুবাদে মনি দত্ত দূর সম্পর্কের কাকা হতে পারে। কিন্তু হারু নয়, একেবারে 'হেরো' বলার মতো মামদোবাজি ঠিক সহ্য হয় না।

তোকে তো আর ফাঁকায় দেখাই যায় না, একেবারে কুটুরে প্যাচা হয়ে গেলি নাকি, ওরে ব্বাস-রে-বাস কি একখান জগঝম্প বানিয়েছিস বাপ। কে বসবে ওটায়, আমাদের জয়াবতী নাকি ?

তা ছাড়া আর মহারাণী দুনিয়ায় কে আছে বলো ? কাকিমাকে না খাইয়ে খাইয়ে তো শুকনো আমলকি বানিয়ে ফেলেছ, না হলে আমি নিজেই কোলে তুলে কাকিকে ওটায় বসিয়ে দিতাম।' গলায় গুড়ের মুড়কি আটকানোর মতো কেমন থতমত খেয়ে কঁককঁক শব্দ করে মনি দত্ত। হালকা একটা আদুরে বাঘথাবায় মনি দত্তকে নিজের দিকে টেনে নেয় হারু। একটা মাঠময় হাসি দিয়ে বলে—

রাগলে নাকি খুড়ো। খাও একটা সিগারেট খাও।

আরে ডাক্তারের বারণ হয়ে গেছে। এক কাপ চা পর্যন্ত শালার ঠোঁটে তুলতে পারি না। চিনি ছাড়া চা মুখে তোলা যায়, তুই বল।

মনি দত্তর ভুঁড়িতে টুসকি মেরে হারু বলে—

সিগারেট না, চা না, মদ না—কিন্তু না খেয়ে কি নিয়ে বাঁচবে খুড়ো। দু দিনেই তুমি টেঁসে যাবে মাইরি। ওসব এক-আধটা নেশা না থাকলে শালা ভাবনা-চিন্তাগুলো বড় ইঁদুরের মতো কাটে। তা ছাড়া তোমার ব্যারামটা বা কি যে সব ছেড়েছুড়ে নাগা হয়ে যাবে ? কবে বুকে একটু হাঁপ উঠেছিল তো কি হয় ? শংকর ডাক্তার তো বলেছিল পেটে বায়ু বদহজম থেকেই ওটা হয় ? যা কর ধর্ম সামলে তুমি শালা না খেয়ে, না পরে জলদি ফুটে যাবে আর তোমার ছেলেরা তখন বড় পাতি ফুঁকে দিব্যি মজা লুটবে। তার থেকে মজাসে থাকো। ওসব ভাবনা-ফাবনা বাদ দাও, বুঝলে খুড়ো ?

মনি দত্ত ঠিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তাকে হারু এত মধুঢালা কথা বলবে। খুশি-বিস্ময়ে মাখোমাখো গলায় সে বলে, তুই

ঠিক বলেছিস হারু। কলক্যাতার ডাক্তারও আমাকে তাই বলেছে। ভাবনা-চিন্তা দুঃখ-টুক্খো একদম বাদ দিতে বলেছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি না ওগুলো তাড়াই কি করে। ভাবব না, দুঃখ করব না বললেই তো ভাবনা-চিন্তাগুলো ধরে যায় না।

হারাধন মনি দত্তর থুতনিতে হাত দিয়ে একটু বু-বু আওয়াজ করে বলে, তোমার দ্বারায় কিসস্য হবে না খুড়ো। বুকে একটু ফর্তিফার্তা না থাকলে ঘণ্টা হবে। তুমি শালা গুনে গুনে ঠিক তিন মাস পরে টেঁসে যাবে। আমি কাকিমার তখন একটা জোয়ান বর জোটাব—মাইরি বলছি।

কচুপোড়া মুখ করে মনি দত্ত বলে—

তুই কথায় কথায় বড় মুখ খারাপ করিস। ঐজন্যে কেউ তোর ছায়া মাড়ায় না।

হারাধন গলা ফাটিয়ে হাসে। ঝরাপাতার মিছিল লেলিয়ে দেওয়া যে বড় বেয়াড়া হাসি, শুনলে ঠাণ্ডা মড়ারও গায়ে জ্বালা ধরে যায়।

চোখ রগড়ে হারাধন যখন উঠল তখন বেলা পুড়ে খাক। বেঞ্জিটা ঘরে তুলল। দেওয়ার সঙ্গে খাটিয়াটা দাঁড করিয়ে চকাচক এক ঘটি জল খেতে খেতে ঘুমন্ত জয়ার ঘুমে থকথকে কাদা-কাদা শরীরটায় জিভ দেওয়ার মতো দূর থেকে লেহন করল। তারপরেই হঠাৎ কেমন থির নির্বাত, নিস্পন্দ শিখার মতো একরোখা। বিশাল সিংহাসনটা পিঠে ফেলে মশাটের দিকে হাঁটা দেয় হারাধন। মশাট থেকে সাইকেল রিকসায় চণ্ডীতলার বাজার। যাত্রা পার্টির লোকেরা ওখান থেকেই টেম্পো করে পট্টা কলকাতা নিয়ে যাবে। খুচরো সার বিক্রির দোকানগুলো পেরুতে পেরুতে রীতিমতো গাঁদি লেগে যায় হারুর পেছনে। চারদিক ভোটের পোস্টারে ছেয়ে গেছে। দেওয়ালে হিজিবিজি দেখতে দেখতে চোখ ভরে যায়। একটু ফাঁকায় গেলেই কিন্তু চোখে জলপটি দেওয়া সবুজ ধূ ধূ ধানের মাঠ। আজকাল ডিপ টিউবওয়েল-এর কৃপায় গর্ত খালি গেলেও জমি খালি যায় না। তবু কেন যে শালা লোকের অবস্থা ফেরে না! হঠাৎ মাথার পোকা নড়ে ওঠে হারাধনের। মাইন পার হবার আগে বাঁ দিকে দীনু স্যাকরার দোকানের পাশের গলিটায় ঢুকে পড়ে। পাঁচু সাগার শুঁড়িখানার চেতালো রোয়াকটায় পিঠের সিংহাসন নামিয়ে ধুপ করে বসে পড়ে।

এ গলিটা হারাধনের আজকের চেনা নয়। গত পনেরো বছরের কত ঝড়-ঝাপটা সমেত বন্ধুত্বের রাঙা ধুলো আজও চটিতে পুরু হয়ে আছে। ওকে দেখেই পাঁচু আর কেলো বেরিয়ে আসে। ফুলুরির খোলা নামিয়ে হৈ হৈ করে

ওঠে নরেশ। কয়লার স্তূপের ওপর নিঃঝুম কুকুরটাকে খামকা একটা লাথি কষিয়ে, দাঁড়িপাল্লা থেকে বাটখারা নামিয়ে হুড়মুড় করে বিষ্টু এগিয়ে আসে। হারুকে চেনে না এমন মনিষ্যি এ পাড়ায় একটা নেই। বিরাট সিংহাসনটা দেখে সকলেরই চোখ ছানাবড়া। বিস্ময়ে প্রশংসায় কারুর মুখে কথাটি নেই। সকলেই নানা মতলব দিতে শুরু করল হারুকে, হারু যে তাদের আপনজন। কেউ কেউ আবার তাতাচ্ছে হারু নিজেই যাতে ওটা কলকাতা নিয়ে গিয়ে দুশো-আড়াইশো টাকায় বিক্রি করে। হারু নিজের গেলাস ভরে আর মিটিমিটি হাসে। এখন আর ওর চোখে কোথাও ধূমকেতু নেই। গলায় মদের মরণ ছায়া ঢেলে বলে,

ধুস, রাজ্যের পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। আরে এখন আর কিছুই হবার নয়। বায়নার টাকা খেয়ে বসে আছি যে। এখন যাকে তাকে বেচব বললেই হল?

বিষ্টুটা আগের মতোই কাঠগোঁয়ার আছে। হারুর হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলে—

হবে না বললেই হল? তুমি কি যে বল হারুদা, বায়নার টাকা বুঝি ফেরত দেওয়া যায় না?

যাঃ তেরি, শালা মানুষের কথার একটা দাম নেই বুঝি। একি তোর কয়লার ডিপো পেয়েছিস। আমি আজ উঠি, তোরা বোস। সবাই একসঙ্গে হা-হা করে ওঠে। দু-তিনটে শাদা ঝাঁঝালো গেলাস যেন ভোজবাজির মতো হারাধনের সামনে জমে যায়। বন্ধুত্বের দূর নৌকো ভেসে আসা পীত আলো, অস্তিত্ব বনাম ভালোবাসার কিছু অস্থায়ী ধাঁধাঁ আর পরমাত্মীয় নেশার জমাট স্থাপত্যে হারু হারাধন তখন যেন নিজের সেই শিল্পী মনটা নিশ্চিতভাবে ফিরে পাচ্ছে যেখানে সে একাই ঈশ্বর। চিৎকার করে কাকে একটা কি বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ নজর পড়ল এক বোতল কেরোসিন আর একটা এক পাউণ্ডের লম্বা রুটি বগলে তার সেই মামা শ্বশুর প্রহ্লাদ ওরফে প্যালা ঘোষ তাদের পাশ কাটিয়ে হনহনিয়ে অন্ধকারে সটকে পড়ার তাক করছে। আর যায় কোথা। একটা বাজপাখীর ভারি ডানায় হারু দ্রুত পিছু নেয়। বয়েস হলেও বেশ গাট্টা-গোট্টা চেহারা প্যালা ঘোষের। মোটেই ভয় পাবার মতো মানুষ নয়। তবু একদম ঘাড়ের কাছে বাজখাঁই গলায় 'মামু' ডাক শুনে মানুষটার বুকটা একটু ছ্যাৎ করে উঠল। পেছু ফেরবার আগেই হারু প্যালা ঘোষকে ডিঙিয়ে ঠিক তার সামনে বিরাট মালগাড়ির মতো রাস্তা জুড়ে উবু হয়ে বসে পড়ে।

শুনলাম সিংহাসনটা খুব মনে ধরেছে, তাই জিগেস করছিলুম কত দেবেন। কত ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন অথচ ভালো করে হাত উপুড় করবেন না তাই আবার হয় নাকি। বোতল বোতল লালজল বেচে কত মানুষকে টেঁসিয়ে তিনতলা বাড়ি হাঁকিয়েছেন আর আমার শালা না-খাওয়া না-ঘুম সত্তর দিনের রক্তজল-করা ঐ বিশাল সিংহাসনটার জন্যে কমসে কম শ-তিনেক টাকাও ছাড়বেন না? কোনো রকম হ্যাঁ-না করার আগেই প্যালার হাতের কবজিটা হারুর হেফাজতে চলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে বগল থেকে শাদা পাঁউরুটিটা খসে ধুলোয় মাখামাখি। উঠোনে পড়ে থাকা ছাই মাখানো রুই মাছের মুড়োতে এখন শুধু পাংশু নির্বোধ একটু হাসি, সাইডের সোনা বাঁধানো দাঁতটাতেও যেন আর কোনো শক্তি নেই।

তিনশো টাকায় একটা বেতের সিংহাসন কেনার ক্ষমতা আমার নেই।

বাবাজী, শ-খানেক টাকায় যদি হয় তো বল এখুনি দিয়ে দিচ্ছি। হাতের কবজিতে আর একটু জোরালো মোচড় লাগতেই ঘড়ির সোনার চেনটা মড়মড় করে। হারু ফিসফিস করে।

আপনার বোনঝির একটা রেডিও কেনার বড় সখ। আর কিছু বাড়ান মাইরি। অন্ততঃ শ-আড়াই না ঝাঁকতে পরলে কোনো ভালো রেডিও হয় না—সত্যি বলছি।

ওর গলায় ভিজে পায়ের ছাপ চিনতে পেরে এবার একটু সাহসী গলায় প্যালা বলে—

রাস্তাঘাটে এ ভাবে মাতলামি করে কোনো লাভ নেই হারাধন। হাতটা মুচড়ে ভেঙ্গে ফেললেও রাস্তায় তো লোকে পকেটে দু-পাঁচশো টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করে না। বাড়ি এস, দেখি একশো টাকার ওপর যতটা দিতে পারি নিশ্চয়ই দেব।

হারাধন তাতেই হঠাৎ রাজি হয়ে যায়। পিঠে সিংহাসন ফেলে প্যালা ঘোষের পিছু পিছু নিঃশব্দে রেল লাইনের দিকে এগিয়ে যায়। বাণীপুর হাইস্কুলের পাশ দিয়ে দু জনের পেছুতে তখন দিব্যি একটা অন্ধকার ফৌজ। সবাই হারুর চ্যালা। কারুর মুখে টুঁ-শব্দ নেই। সদর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই হারু ভেতর থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। বাইরে অদূরে একতাল অন্ধকারের জটলা হয়ে সবাই দাঁড়িয়ে। ভেতরে প্যালা ঘোষের মুখোমুখি হয়েই হারু চকিতে ওর টুঁটি টিপে ধরে। মদের গন্ধ ভরা চাপা হুঙ্কার ওকে একটা খেপা হায়নার মতো হিংস্র লাগে—

একটু চিল্লাবার চেষ্টা করলে একে বারে খতম করে দেব।

এ কথা বলার অবশ্য কোনো মানে নেই। ওর পরিশ্রমী আঙুলের আদরে এমনিতেই প্যালা ঘোষের চোখ কপালে উঠেছে। কিন্তু হারুর এখন আর ওসব খেয়াল নেই। সে আবার চাপা গর্জন ছাড়ে।

আমাদের সোনার মেয়ে কোকিলটা যে তোমার ঘরের বউ হবে আর তুমি ওর মাস্টার বাপকে দুয়ে দশটি হাজার টাকা ঝাড়বে এ-সব খবর আগে জানলে তোমার মতো গেঁড়ে খচ্চরকে কি করে টাইট দিতে হয় তা দেখিয়ে দিতাম। আমার শালা ঐ ধেড়ে সিংহাসনটাই কাল হল। দু মাস ঘর ছেড়ে ফাঁকে বেরুই নি আর তারই মধ্যে সব শালা ওলোট-পালট হয়ে গেল। ঐ সিংহাসনটা রেখে গেলাম কোকিলের জন্যে। ওর বিয়েতে যৌতুক দেওয়ার মতো হাতে কিছু নেই। ওটার জন্যে তোমাকে একটা পয়সাও দিতে হবে না। শুধু দেখবে ওদের বাড়িতে যেন কালই সিংহাসনটা পৌঁছে যায়, তোমার বাড়িতে যেন একবেলাও ওটা না থাকে।

উদনচণ্ডী হারাধন কি করে হয়তো বোধ করেছিল এতবড় তিনতলা বাড়িতেও সিংহাসনটা ধরবে না। উঠকো একটা ঝড়ের মতো যখন হারাধন সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওর আকাশ ছোঁয়া মাথায় তখন অনেক পান্নার মতো সবুজ তারার রাজমুকুট। পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করে লম্বা লম্বা হাত তুলে ও তখন গভীর অন্ধকারে এক নাচের মুদ্রা দিল। দশ হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে একটা দুরন্ত জলজ্বলে গ্রহের মধ্যে ওর ছায়া পড়ল। সবাই দল বেঁধে ফিরে এল পাঁচুর শুঁড়িখানায়। প্যালা ঘোষের মতো ছুঁচোর কাছ থেকে আড়াইশো টাকা ছিনিয়ে এনেছে বলায় হারুকে আজ ওরা কাঁধে তুলে নাচতে চায়। সবাইকে কাঁধ টিপে মাটিতে বসিয়ে হারু চিৎকার করে।

খা শালা কে কত মদ খেতে পারিস আজ দেখব আমি। অজস্র মদে রাত্রির গরল ধুয়ে কিশোরী জ্যোস্নায় আকাশ ছেয়ে যায়।

যত রাত বাড়ে ওদের কথার কামাই নেই। হারুর মাথায় তখন দুনিয়ার সব থেকে ধুরন্ধর ব্যবসায়ী ভর করেছে। একটি সিংহাসনে যদি আড়াইশো, দুটোয় তা হলে পাঁচশো, চারটেতে হাজার···দশ হাজার বিশ হাজার···। কি এমন কঠিন। কিছু লোক রাখলেই হল। কিংবা তারই দরকারটা কি। এখানের সকলে হাত লাগালেই তো ল্যাটা মিটে যায়। দুনিয়ার যত প্যালা ঘোষ আছে সবাই কিনবে তখন। আর না কিনে যাবে কোথায়। টাকা দিয়ে

কি ব্যাটারা স্বগ্গে বাতি দেবে? যত সোনার ঘড়ি কিনবে তত কবজি ছিঁড়ে হবে। যত সোনালী চশমা পরবে তত চোখের জ্যোতি যাবে। তখন বোঝ ঠেলা। কিসে খরচা করবে যাদু? হে-হে-হে, বড়লোকগুলোর কত কষ্ট মাইরি। শালারা খেতে পারে না চর্বির ভয়ে, শুতে পারে না হার্টফেল করার ভয়ে, মুততে পারে না চিনি বেরুবার ভয়ে, সিগারেটে গলায় ক্যান্সার, মদ খেলে লিভার পচে রক্ত আসবে···হে-হে-হে।

শেষ রাত্তিরে সবাই যখন একে একে চলে গেছে, হারু তখন টলতে টলতে বাণীপুর হাইস্কুলের প্রকাণ্ড মাঠটায় দিব্যি নিজের শরীরটাকে ঘাসের ওপর মেলে দেয়। ভোর রাতে অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে কার যেন মুখ ভেসে আসে হাবাধনের মাথায়। মদের নেশার এই এক বড় দোষ, কিছুতেই ভালো করে মুখ চেনা যায় না, বোঝা যায় না মুখটা কোকিলের না দোপাটির।

রাজা আমার

নম্বরি খেলুড়েরা সবাই মাঠে ঢুকে পড়েছে, এখন শুধু কিক-অফ হুইসিল্ বাকি। শীল্ড ফাইনালের এই বিশেষ মুহূর্তে বিরাট জনতা যে-ভাবে একটা নীরব উৎকণ্ঠায় চুপ থাকে, কতকটা সেইরকম নিরাকার উৎকণ্ঠা নিয়ে সুবিনয় ভাবে— বাদল কি এখন উঠেছে? উঠেছে নিশ্চয়ই, তবে বিছানা থেকে নয়। ওর কাছে বাজার-ফাজারের কথা এখন ওঠেই না। ভাল্লাগে না। তার ওপর আর কথা নেই। এক এক সময় ভাবে সুবিনয়, ঠিক কী রকম বাপ হতে পারলে ঈশ্বরের রাজত্বে কোনো ধ্যাষ্টামি থাকে না। অশোক হিটলার চৈতন্য মুসলিনী কার সঙ্গে প্রতিমার বিয়ে হলে তার গর্ভ আলো করে এমন কেউ জন্মাত যে রোজ রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে মাছের রক্তপিত্তি-কাদামাখা বাজারের সহিষ্ণু থলি হাতে বাজার যেত, তারে-ঘেরা শিশুগাছের মতো বাহুর আশ্রয়ে আগলে বোনকে বাসের ভিড় বাঁচিয়ে স্কুলে পৌঁছে দিত, আর কিছু পুরনো কাগজের বিনিময়ে বাবার জন্যে নিদেন পক্ষে দু প্যাকেট নাম্বার টেন···।

গাড়ির টায়ারে থ্যাঁতলানো একটা ফর্দাফাঁই কুকুরের মরদেহের মতো দালানের কোণে বাজারের থলিটা মুখ থুবড়ে নিঃসাড়। তার ওপর খানিকটা ত্রিকালজ্ঞ রোদ বড় নির্বিকার। সেদিকে তাকিয়ে সুবিনয়ের নিজেকেও কেমন ত্রিকালজ্ঞ মনে হল। বাবা দেখতেন, আমি দেখছি। হয়তো বাদলও দেখবে—এই রোদ, মুখ-থুবড়ে থাকা বাজারের থলি এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সর্বসাকুল্যে তিরিশ হাজার টাকায় কেনা দু-কাঠা জমির ওপর দু খানা ঘরের নাছোড়বান্দা এক প্যাকেট ঝলমলে স্বপ্ন। জীবনে প্রথম সুবিনয় একটা হরলালকা ব্যথা অনুভব করে। একটু যেন আরাম চায়। নাইবা হল অফিস বাজার সানুর স্কুল। প্রতিদিন সব কাজ ঠিক ঠিক করতেই হবে? নিজস্ব কোনো সাধ ইচ্ছে থাকতে পারে না? মানুষ কি জানোয়ার? কিন্তু এতসব বাকতাল্লার দাম কি? একঘর বউ-ছেলে নিয়ে সন্ন্যাসী বিদ্রোহী কিস্সু হওয়া যায় না। তবু বাদলটা যদি একটু হাঁফ ছাড়ার সুযোগ দিত। কথার একটা জবাব দেওয়াও প্রয়োজন মনে করে না। একটার বেশি দুটো কথা বললে কেমন খুনীর চোখে তাকায়। জগতের সমস্ত বিরক্তি ছাড়া যে

চোখে কখনো রোদ ছাখে নি সুবিনয়। নিজের টিউশানির টাকায় বি-কম পড়া, প্যান্টের ক্রেয়ার এবং সিগারেট খরচা সবই বাদল নিজে টানে। কিন্তু এ-সবের জন্যেও যদি তাকে বাবার কাছেই হাত পাততে হত তা হলেও কি ও এতটুকু মিষ্টু হত, একটু নুয়ে পড়া? কে জানে।

বিছানায় রাখা সান্নুর পেটমোটা ফুলদানিতে সিগারেটটা নেভাতে নেভাতে ঘাড় না ফিরিয়েই বাদল অনুভব করে দালানে ঠিক তার জানালার পাশেই একটা বেতছেঁড়া চেয়ারে তার প্রাগৈতিহাসিক বাবা খবরের কাগজ পড়ার ছুতোয় বাদলের নড়াচড়া শুনছে। হ্যাঁ শুনছে, কিন্তু দেখছে না। কতবার বলেছি আমায় একটু একা থাকতে দাও। আমার নড়াচড়ায় ওৎ পাতা আমি পছন্দ করি না। আমি কি চিড়িয়াখানার শাদা বাঘ যে বাড়ির সবাই আমায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখবে আমি কী ভাবে পায়চারি করি, আয়নার সামনে টেরি বাগাই, প্যান্টের জিপ নামিয়ে মেয়েলি শরীরের ব্যাকরণ পাঠ করি। আমি যা আমি তাই। আমি তো তার বেশি কিছু দাবিও করি না। তা হলে ব্যাপারটা কি। আমার কিছুই যদি তোমাদের মাথায় না ঢোকে তা হলে দোষটা কার? এখনকার লো-শিলিং বারো শো স্কোয়্যার ফুটের নিজস্ব ফ্ল্যাটে স্যানিটারি ন্যাপকিন রাখারও লুকনো জায়গা থাকে—সেসব কি তোমরা জান? মেয়েরা আসে কেন আমার কাছে। আমি তো তাদের পায়ে ধরে শাড়ি আলগা করার জন্যে ঘরে ডাকি না। তারা নিজেরাই আসে। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। সেটা কি শুধু প্রেম-ট্রেমের বুলি আওড়াবার জন্যে? ননসেন্স।

সুবিনয় খুব ভালোই জানে এখন প্রতিমা কেন এ ঘরে এসেছে। অনেকক্ষণ জল চলে যাওয়ার পর আবার জল এলে কলের ভেতর প্রথম যেমন ঘড়ঘড় ভড়ভড়, তার পরেই ভরদা করে জল আসে, প্রতিমারও এখন ঠিক তাই। ছেলেটা যে কেন এমন হয়ে যাচ্ছে, তুমি যদি একটু দেখতে—। কতবার বললাম, তোমার রিটায়ারের আর এক বছরও নেই, এইবেলা ছেলেটাকে তোমাদের অফিসে ঢুকিয়ে দাও, তা আমার কথা আর কেইবা···। ছেলেটা দিন দিন যে কেমন হয়ে যাচ্ছে···। সুবিনয় প্রথমে মিচকে বোড়ার মতো বলতে চায়, কারুর পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সুধাসংগীত বাজে না প্রমি। তার পর দাঁতে দাঁত চেপে বলতে চায়, আর গ্যাজ গ্যাজ কোরো না প্রতিমা। তার চেয়ে আমার লাশ দেখিয়ে তুমি, প্রতিমা—আমার বিধবা বউ আমার অফিসের জি-এমকে যদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছেলের জন্যে ভিখ মাগতে তা হলে হয়তো একটা কিছু···হয়তো। তার বদলে সুবিনয় বলল, তুমি তো সবই

জান প্রতিমা, আমি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নি। তা ছাড়া তোমার ছেলেও তো এ-সবে তেলেবেগুন। এর ওপর আমার আর কি করার থাকতে পারে। অত্যন্ত নির্বিকারভাবে প্রতিমা এক চিমটে চিড়চিড়ে ঝাঁজানি দিতে চাইল, তোমার এই 'আমার আর কি করার থাকতে পারে' শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা। সুবিনয় বেশ জানে, এই ভাবে এখন শুধু পুরনো পালিশের ওপর শিরিষ কাগজ ঘষা চলবে বেশ কিছুক্ষণ, অথচ নতুন পালিশ আর কোনোদিনও পড়বে না। প্রতিমা বালিশের পাশে চশমা খুলে চোখে হাত চাপা দেয়। সারা জীবন শুধু আমার কি করার থাকতে পারে শুনতে শুনতে জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। যদি কিছুই করার না থাকে, কোনো কিছুরই যদি মুরোদ নেই তোমার, তা হলে এত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে আমাকে ঠকাবার কি দরকার ছিল? কেন মিথ্যে আশা দিয়েছিলে রিটায়ারের টাকাটা পেলে খোলামেলা কোথাও দু খানা ঘর তুলে নিরিবিলিতে থাকতে পাবো। তার বদলে চারিদিক থেকে গিলতে আসছে সারা বেহালার এঁদোপড়া নোংরা আর ভিড়। কি, না ছেলের পছন্দ নয়। দূরে থাকলে কলকাতায় যাতায়াতের অসুবিধে। অথচ বাড়িতে যে কতক্ষণ থাকেন বাবু। প্রতিমা কিন্তু আজও চোখ বুজলেই দেখতে পায় হাজারিবাগে তার বাবার মস্ত বাগানঘেরা কোয়ার্টার। মনে পড়ে না ঠিক, বাবা তখন বোধ হয় থানার মেজবাবু। তবে তাঁর বাগানের জৌলুস বড়বাবুর বাগানের দু গুণ। শখ ছিল মানুষটার। প্রকাণ্ড সব ডালিয়া-গোলাপে তাঁর মৃত্যুকালীন চোখের শিশির। বাবার হাত-ধরে একটা সরু গলা লম্বা লোহার ঝারি থেকে সকাল সন্ধে গাছের গোড়ায় জল ঢেলে বেড়ায় যে আর এক হারানো প্রতিমা। চারিদিকের পাহাড়ের ওপর তেজী নীল আকাশ, রোদে মহুয়া আর নাগচাঁপার বুনো ঘ্রাণ। বাবার নীরব গোধূলি তখন একটা গেরুয়া গোলাপের ওপর। বাবা গো, কতদিন দেখি নি তোমায়। আজও গোলাপে গোধূলিতে বাবার চোখের শিশির। জীবনের নিতান্ত পরাজয়ে আজ একা একা কাঁদছে তোমার প্রমি, তোমার মন কেমন করছে না বাবা?

এখন অবেলায় শুয়ে আছিস, তোর কি শরীর খারাপ, খোকা!

কতবার বলেছি খোকা খোকা করবে না, তবু সেই খোকা। কিছু হয় নি আমার। এমনি শুয়ে আছি।

এমনি এমনি শুয়ে থাকারও অধিকার নেই আমার? সবকিছুর কৈফিয়ত চাই, জবাব চাই। আমার কিছুর জন্যেই আমি কারুর কাছে জবাবদিহি করতে পারব না। ভোরবেলা বিছানা থেকে ডেকে তুলে অমলদাকে কী ভাবে

ভুঁড়ি ফাঁসিয়েছিল ভোলা যায়? অথচ অমলদার ফ্লানেলের পুরনো কোটটা এখনো আমার বাকসে। কোটটায় চাপড় দিলেই ভক করে সেই নস্যির গন্ধ— অমলদার ধুলো। ওটা ছাড়া আর কিই বা নেওয়া যায়। উত্তাপ ছাড়া লোভ দেওয়ার মতো আজকে আর তেমন কিছু আছে কি? তাপসীর কাছেও উত্তাপ চাই। দশ মিনিট সময়ের স্তনে হাত। এক খামচা যৌনতা। বিপ-বিপ-বিপ-বিপ, জাপানী নিশানের ছুটন্ত টেললাইটে ইঙ্গিত—ডাইনে না বাঁয়ে? কোন পাশে সরাসরি কাজ সারার সুবিধে।

তোকে কতবার বলেছি তাপসী, তুই আসবি না আমার কাছে। আমার দোষ?

দোষ দোষ দোষ, তুই বড্ড বোকা তাপসী। এখন আর কেউ দোষ করে না, পাপ করে না। নিজের দোষটা শুধু আরো বড় রাজনৈতিক দোষ বা পাপে চালান করে দিলেই সব সাফ। আসল দোষ আসল পাপ এখন শুধু নিজেকে খুন করতে না পারার মধ্যে। তুই নিজেকে এখনো ভালো করে খুন করতে পারছিস না। তাই আমার সঙ্গে শুতে ভয় পাস। তাই তোর এত যন্ত্রণা। যন্ত্রণা নিয়ে রাত করা যায় না তাপস। শুতে আমার বড় ভয়, বাদল। আমার এখনো বিয়ে হয় নি। তুই আমায় বিয়ে করবি কিনা তাও এখনো জানি না। তাতে কিছু যায় আসে না তপু। তোকে কতবার বলেছি পিল খেতে।

কিন্তু আমি তোকে বোঝাবো কেমন করে বাদল, যে ভালোবাসা মানে শুধু গর্ভনিরোধক পিল নয়। তোকে আমি ভালোবাসি বাদল, তুই আমার রাজা।

তুই অত সিগারেট নাইবা খেলি খোকা। ওটা শরীরের পক্ষে মোটে ভালো নয়। দেখিস নি আজকাল প্যাকেটে কি লেখা থাকে? কিসের এত ব্যর্থতা তোর। কার ওপর এত রাগ। সব মানুষকেই তো কিছু না কিছু ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। তার জন্যে শরীর নষ্ট করার কি কোনো মানে হয়।

তুমি আমাকে শরীর নিয়ে জ্ঞান দেবার চেষ্টা কোরো না, সুবিনয়বাবু। আমি আজীবন শরীর নিয়েই বেঁচে আছি। শরীর ছাড়া কিছু বুঝি না আমি। আসলে এ-সব ফালতু কথার জন্যে তুমি আস নি আমার কাছে। তুমি শুধু আমার জবাবদিহি চাও। বাবা হওয়ার সুযোগ নিয়ে আমার যৌনতা সম্পর্কে জেরা করলেও আমার তার জবাব দিতে হবে—তাই না? পাশের বাড়ি থেকে ফোনে ডাকতে এলে আমি বাড়ি না থাকলেও তুমি ফোন ধরতে যাও, কেন?

আমাকে কারা ফোন করে, কারা প্রেম করে সব তোমার জানা চাই, কেমন? তোমার লজ্জা করে না আমার আর তাপসীর কথা আড়ি পেতে শুনতে? এ-সব যথেষ্ট হয়েছে, আর না। আর থাকব না। না খেয়ে মরলেও না—।

খোকা, খোকা, কোথায় যাচ্ছিস অমন করে? বাইরে এখন রোদের বড় তাপ। তোর কষ্ট হবে রাজা আমার। যাস নি, শোন। একটু নেবুর শরবত করে দেব? ছ্যাঃ, এক মিনিট দেরি হবে না…। বাইশ পেরুনো নির্বাক ছেলের জ্বলন্ত চোখে তীব্র নিয়নে লেখা রইল থাক, আর ন্যাকামি কোরো না।

বাইরে যাওয়ার জুতোটা খাটের তলায় ঢুকে গিয়েছিল। বাপ সুবিনয় হাঁটু-ভেঙে বসে ছেলের জুতোটা খাটের তলা থেকে হেঁট হয়ে বার করার চেষ্টা করল। তখন পেছন থেকে তার কাঁচাপাকা মাথাটা এমনভাবে নুয়ে রইল যেন 'প্রভু আমার' বলবে। জানলার খড়খড়ি বন্ধ, অন্ধকার ঘরে তখন সত্যিই এক প্রভুহারা স্তব্ধতা। জুতো পরার জন্যে কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। ছেলে বাদল রবারের হাওয়াই প'রে তার অনেক আগেই নিষ্ক্রান্ত। বাপ সুবিনয় তাকে ফিরিয়ে নেবার একটা ঝুঁকিয়েপড়া আকাঙ্ক্ষায় পাগলের মতো লেক রোড ধরে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের দিকে ছুটল। বাইরে তখন ফুটন্ত রোদের মহাসাগরে জ্যৈষ্ঠের কলকাতা ভাসছে। বৃদ্ধের ছানিপড়া চোখে সে-রোদ তখন দৃষ্টিবিনষ্টকারী আশিব মতো নিষ্ঠুর কৌতুকে হাসছে। এ শীতেও ছানি কাটা হল না। পরের শীতে হয়তো আর ছানি কাটার দরকার হবে না। কত চোখই তো এই পৃথিবীর পরের বছরের শীত দেখবে না। খোকা, সরি সরি স্যার, বাদল, তুই ফিরে আয়। আর একবার সুযোগ দে আমায়। আমার পরিণত যৌবনে তোর শিশু পায়ের ধুলো লেগেছিল, খোকা। আমায় ফিরিয়ে দে তোর শিশুপায়ের ছাপ-আঁকা সেই নীল টুইলশার্টের বিভ্রান্ত যৌবন—যার পকেটে খাপছাড়া দোমড়ানো দুটি যমজ ক্যাপস্টেন, মুখে অনাদি মোগলাই পরোটার নিবিরোধ স্মৃতি আর সারা অঙ্গে ম্যাটিনি মেট্রোর গন উইথ-দ্য-উইণ্ডের মুগ্ধ সহবাসের তীব্র সুবাস। খোকা আমার, রাজা আমার, আমার রক্তচোষা দুর্জয় অক্টোপাস, তোর শিশু পায়ের ধুলো আমার যৌবনে…। তুই তখন বাসের টিকিট জমাতিস। পকেট থেকে বাসের টিকিট নেবার জন্যে কি দস্যির মতো ঝাঁপিয়ে পড়তিস আমার বুকে। বাস আসে, বাস যায়, পুরনো টিকিট কেউ আর ভালোবাসার মতো জমিয়ে রাখে না।

ওদিক থেকে সত্যিই তখন একটা অতিকায় লাল ডবল ডেকার। দূরে দেখা যায় বাদলের নীল জিনপরা ঋজু লম্বা চেহারা জনহীন গ্রীষ্মের রাস্তায় দূর

মরুস্থানের স্থিরচিত্র হয়ে ভাসছে। গলা পিচের সঙ্গে তার রবারের চটি আটকে গেছে। পায়ে দড়িবাঁধা একটা মুরগির ডানা ঝাপটানো। স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে চটিটা রয়ে গেল। গরম পিচের ওপর এখন বাদলের নগ্ন পা। পারস্য উপসাগরের ওপার থেকে একজন টেলেক্স পাঠাবার চেষ্টা করছে, খোকা। তোর পায়ে ফোস্কা পড়ে কত কষ্ট হবে কতদিন ঠিকমতো চলতেই পারবি না। কিন্তু এ-সব খবর কোনোদিন কোথাও পৌঁছুবে না। যন্ত্রটা বহুকাল বিকল। বাদল ডবল ডেকারের হাতলে ঝুলে পড়ে। তার ফোস্কা সমেত একটি ঝুলন্ত পা বিস্মৃত উত্তমর্ণের দিকে, অন্য পা যুদ্ধময় কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তর পরিক্রমারত শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব লেল্যাণ্ড রথে!

কমনীয়ভাবে দৃষ্টিহীন

সমীর যখন ঢুকল তখনো অনেক চেয়ার খালি। বাজনা শুরু হয় নি। রঙিন আলোর খেলাও শুরু হয় নি। সমীর নিজে কিন্তু আগের থেকেই বেশ রঙে ছিল। উপায় নেই। একরত্তি এই ভাইজাগ শহরে সন্ধে থেকে করারই বা আছেটা কি। অবশ্য করার কিছু থাকলেই যেন সমীর কত কি করত। পানের দোকানগুলোয় কোলের শিশুর উরুর মতো ইয়া মোটা মোটা কলার কাঁদি, পথে পথে লম্বা বেণীতে ঈষৎ লালচে পুষ্ট চাঁপার ঝাঁক, চুট্টা-হাতে পাথরে কোঁদা পুরুষ্টু কামীন আর কফির গন্ধে ভারি গর্ভিণী বাতাস—এ-সব সমীরের পক্ষে নতুন কোনো রস আনে না। নাক টিপে চার দিন ফতে করতে পারলেই ফের কলকাতা। সন্ধে প্রায় সাড়ে সাতটা থেকে মিহির সেনগুপ্ত আর তার ন্যাকা বউ রুবির সঙ্গে ওয়ালটিয়ার ক্লাবে কিছু না হোক অন্তত পাঁচ-ছ পেগ টানা হয়ে গেছে। এটাই হল এখানকার সব থেকে অভিজাত ক্লাব। সব জায়গাতেই এইরকম এক-একটা আভিজাত্যের হাইড্রোসিল থাকে, সেটা খুব বড় কথা নয়। মস্ত কম্পাউণ্ডের বগলে নানা গাছ-গাছড়ায় সমুদ্রের হাওয়া খেলে চমৎকার। মুস্কিল হচ্ছে ব্রিটিশ আমলের এই এঁদো-পচা বাড়িটা। উঁচু উঁচু সিলিং, পেল্লাই দরজা আর ঘুণধরা সব মেহগনির প্যানেল সমেত সারা বাড়িটার বিরাট গতরের আনাচেকানাচে কত যে ইঁদুর-ছুঁচো ডন মারছে তার হদিশ নেই। মাকড়সার জালে ভরা ধ্বসা-পচা আধা অন্ধকার বার-টা একটা বুড়ো কুকুরের ঢাউস পেটের মতো ধুঁকছে। এখানে একা একা বেশিক্ষণ বসলে নির্ঘাত হ্যামলেটের ভুত ঘাড়ে চাপবে। রুবি সঙ্গে ছিল, তাই রক্ষে।

মেয়েটা যতই ন্যাকা হোক সমীরের ছোটখাট আবদারগুলোকে বেশ প্রশ্রয় দেয়। কোমরে বা উরুতে হাত পড়লে তিড়িং করে শক্ খায় না। বরং টেবিলের তলায় পায়ের বিলি কাটায় বেশ সক্রিয় থাকে। কানে দু-চারটে ভুজুং দেবার সময় ওর মেয়েলি ঘাড়ের গন্ধটা বেশ ঝামেলা করে। কেমন একটা ঘাম-পাউডার গন্ধ। মেয়েদের ঘামের গন্ধে এমন একটা উত্তেজক ব্যাপার থাকে যে নিজেকে সামলে রাখা মুস্কিল। দুনিয়ার তাবৎ ক্রিশ্চান দেঅবুদের জিগেস

করতে ইচ্ছে করে, বগল সাফ করার ফ্যাশান চালু করে মেয়েদের যৌনতাহীন পাথরের স্ট্যাচুতে পরিণত করার মানে কি। মাথায় একমাথা চুল থাকতে পারে আর সে চুলের ওপর আরো বড় চুলের মুকুট পরা চলে, অথচ বগলে একটা ডট-পেনের ডট থাকলেও ঘোর অপরাধ। ক্লাব থেকে ফাঁকা হাওয়ায় বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সমীর খানিকটা চাঙ্গা বোধ করে। মিহির এখনো বিলিয়ার্ড ঘরে গাও আর একটা তেঠেঙ্গে লম্বা রোগা পাঞ্জাবীর সঙ্গে গুডনাইট করতে গিয়ে সমানে বকবক করছে। কম্পাউণ্ডের ওদিকের অন্ধকারে গাড়িটা ঘুমিয়ে। রুবির দয়ালু কোমরে হাত রেখে ঐদিকে যেতে যেতে সমীর বলে, আমাকে আর কোনো ঐতিহাসিক গুদোমঘরে নিয়ে যেও না রুবি। রাজা-বাদশাদের ঢাল-তবোয়াল জাঙিয়া আর লালদড়িতে আমার একটুও উৎসাহ নেই। তুমি কি জান আমি একটা পাঞ্জাবী মেয়ের খোলা পিঠ দেখতে এমনই মশগুল ছিলাম যে জয়পুরের রাজবাড়িতে ঢোকা হয় নি।

অন্ধকারে ঝিলিকমারা একটা হাসির লাইটার জেলে রুবি বলে, তুমি এক এক সময় এমন নাইভ্ কথা বল সমীর, তুমি কি সত্যিই এত সরল ?

সমীর কেমন মিইয়ে গিয়ে ভাবে, যাঃ তেরি, আমার ফানটাই মাঠে মারা গেল। সরলতা-ফরলতা আবার এর মধ্যে কোত্থেকে এল। এই মেয়েটাই সেদিন সমীরের একটা লেখার তারিফ করছিল—ভাবতে অবাক লাগে। এর নামই ভদ্রতা ? প্রথম দিন আপল্যাণ্ডে ওদের বোগনভেলিয়া-দোলা বাড়িতে অত সুন্দর মেঘলা সকালটা রুবি একমুহূর্তে কি জঘন্য বাসি করে দিল। মিহির পোর্টে গিয়েছিল, তখনো ফেরে নি। সমীরের সামনে এককাপ চা বসিয়ে দিয়ে হুম করে বলেছিল, তুমি বস, আমার এখন একটু বেরুতে হচ্ছে। তোমার বন্ধু এখুনি এসে পড়বে। হয়তো ঐরকম কোনো আধভোলা অপমান মসৃণ করার জন্যেই মেয়েরা অনেক সময় খামোকা কিছু প্রশংসা করে ফেলে। বোঝে না যে মানুষের মনটা একটা বেডকভার নয় যে প্রচুর যৌন ধামসাধামসির পর ধারগুলো টেনেটুনে গুঁজে দিলেই ফের মসৃণ হয়ে যাবে। বিশ্বাস করতে ভালো লাগে না কারুকে। কারণ বিশ্বাস করার মতো ঘটে নি তো কিছুই। তা ছাড়া মিথ্যে কথাগুলো বুড়ো হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। তার পর এমন নড়বড়ে অবস্থায় কেদ্রে ঝুলে থাকে ঠোঁটের ডগায় যে দেখলেই মাল ক্যাচ হয়ে যায়। সমীর খুব ভালোই জানে কেউই আজকাল ভাবতে চায় না। খামকা চিন্তা বা শোকের ব্লেডে জিভ বোলাতে কেউ ভালোবাসে না। পুরুষ-নারী সবাই আজকাল পেছনের ঝুলবারান্দায় দুপুর বুলবুলি। কেবল ঠোঁটে ঠোঁট, গালে

গান। কলকাতায় সেদিন বউ মালতী বলছিল ওপরের ফ্লাটে ঝর্ণার ছোট ভাইটা নাকি একদিন ভুগেই সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে মারা গেল। বেচারী ঝর্ণার কি কষ্টই গেছে।

এই শেষ বোশেখের রোদে শ্মশানঘাট, অন্য বাচ্চা ভাই দুটোকে সামলানো —এ কি চাট্টিখানি কথা। এইসব বলতে বলতেই মালতী চেন্‌জারে ববির গান লাগিয়ে দিল। একবারও তখন ওর মনে হল না যে এই হাম-তুম-হুম-হুম-হুম-মার্কা গানটা এখন উপরের বারান্দায় ঝর্ণার কানে কতটা মধুবর্ষণ করবে। কিংবা হয়তো ঝর্ণারাও এতদিনে জেনে গেছে যে তার শোককে অন্যলোকেরাই বা কেন দুলালের তালমিছরির মতো গালে ফেলে দীর্ঘকাল চুষবে।

সরলতার ভান করতে পারলে মেয়েদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পাত্তা পাওয়া যায় রুবি।

তার মানে তুমি সবই ভান কর ?

তেজী ঘুড়ির মতো সমীর নিজেকে গোঁৎ খাইয়ে বলে, না, সব না। তোমার কাছেও না। কারণ, আমি জেনে গেছি যে সোজাসুজি তোমার কোমরে হাত রাখলে তুমি মোটেই রেগে যাও না।

যাতে প্রশ্রয় দেওয়া বা অস্বীকার করা কোনোটাই স্পষ্ট নয় কতকটা সেই ধাঁচের আদুরে চোখ মেরে রুবি সমীরের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা টেনে নিয়ে একটা লম্বা টান দেয়, তার পর ঝট করে একপাক ঘুরেই দেখতে পায় অসাবধানী কতকগুলো আলোছায়ার জড়াজড়ির পাশ কাটিয়ে মিহির এখন হেলেদুলে আসছে যেন পৃথিবীতে অঢেল সময়, কোথাও কোনো তাড়া নেই। কাছে এসে একটা জোড়াতালি হাসি দিয়ে মিহির বলে, তোমাদের দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু এবার যেখানে যাব, সেখানে গেলেই সমীরের সব ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

সমীর একটা বেঁকা হাসি টেনে ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গিতে বলে তাই বুঝি ?

এরপর খুব তাড়াতাড়ি প্রেক্ষাপট পরিবর্তন এবং মিহিরের পায়ের রাগী চাপে নতুন ফিয়েটটা গোঙাতে গোঙাতে অত্যন্ত দ্রুত এসে এই বিরাট হোটেলের পোর্টিকোতে থামে। কপালের মতো অধেক গোল, চারিদিক কাঁচে মোড়া প্রকাণ্ড নাচঘরটিতে ওরা বেশ ছড়িয়ে বসে। নেশাটা যখন চোখ ছাপিয়ে ভাগর মোরগের চনমনে ঝুঁটির মতো মাথার মধ্যে লালচালাকি মারছে

তখনই বড় আলো নিভে অদৃশ্য রঙিন আলো সবাইকে ডুবিয়ে দিল। ধীরে ধীরে কখন যে সমস্ত খালি চেয়ারগুলো ভরে গেছে কেউ জানে না। আশ্বিনের গুমোট আকাশ থেকে হঠাৎ মেঘডাকা বৃষ্টির মতো শুরু হয়ে গেছে গমগমে বাজনা। একসময় নাচতে নাচতে মেয়েটা সেই শরীরের খোলা ছাড়াবার খেলায় মেতে উঠল। এতে কার যৌনতা বাড়ে সমীর জানে না। এর থেকে কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিন্যুয়ে কোনো স্বাস্থ্যবতীর চকিত নাভি-দর্শন অনেক তৎপর ঝিলিক দেয়। তবু আজ এই মেয়েটার নাচ থেকে একটা খাটিয়ে কামুকতার আভাস পায় সমীর। ঘুসঘুসে জ্বরের মতো তার নেশা শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। বেঙ্কট একবার বলেছিল ভারতে অন্ধ্রের মেয়েদের যৌনতায় নাকি সব থেকে বেশি উত্তাপ। সত্যি? ঘাড়ের একটা মোটা শিরায় টান পড়ছে। চোখের ওপর একটা ধোঁয়াটে পুকুর থেকে ওঠা দুটি ভরাট উরু, যার মধ্যে একই সঙ্গে বোশেখের জ্বলন্ত রোদ, ভাস্কর্য এবং গুহার স্যাঁতসেতে শ্যাওলা সত্ত্বেও মেয়েটির নগ্ন কাঁধ দেখে কেন যে সমীর, এই, তোমার শীত করছে না এই ধরনের বাসি টাঙাইলপরা গেরস্থ সংলাপ তৈরি করল বোঝা গেল না। হয়তো ঘরের ঠাণ্ডাটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই। হাতের আঙুল, পায়ের চেটো, নাগের ডগা সবেতেই সেলো টেপের মতো অনড় ঠাণ্ডা। ওরা শীত পায়, ওদের জন্যে কোনো মেয়েলি বাসা··· । তাই নাকি? শুধুই ঠাণ্ডা মেশিনের ঠাণ্ডা? ব্যাস? খানিক মেঘলা চোখে প্রায় আধখামচা-ভাবে অথচ যথেষ্ট কামুকতা নিয়ে সমীর ভাবতে চেষ্টা করে যৌনতার চরমে পৌঁছে—এমন কি প্রায় উপগত হবার লগ্নে সে কি কখন কারুর চোখে আধ-ছেঁড়া মলিন ব্রা-স্ট্র্যাপের ছায়া দেখে ফুঁপিয়ে উঠতে চেয়েছে—আহারে, মেয়েটার যত্ন নেবার কেউ নেই কেন—ভালোবাসার··· ? স্টুপিড, যত সব ন্যাকামি। তুমি নিজেকে কি ভাবো সমীর, রাষ্ট্রপতি না সাঁইবাবা? কাউকে পিটি করার অধিকার কে দিয়েছে তোমায়? দয়া দ্যাখাচ্ছেন? নাঃ, 'দয়া' শব্দটায় কোনো ঝাঁঝ নেই, শব্দরা সব বাসি বেশ্যা হয়ে গেছে। কেউ আর সুকুমারী নেই। হাড়গোড় রক্ত লিভার ফুসফুস—এরা কি শালা দয়া করে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে? উঃ, বাজনাটা কি জোর, তাল বাড়তে বাড়তে একটা মেকি সঙ্গমের আরাধনায় চড়তে চায়। তার সঙ্গে তাল রেখে কাঠের মেঝেতে শুয়ে মেয়েটা বেদম কোমরতোলা দিচ্ছে। অতঃপর একটা খেল খতম। ডিমার নিভে একসময় উজ্জ্বল আলোয় ঘর ভরে যায়। চাপা উল্লাস আর শীতকালের রোদ দু হাতে ঠেলে মেয়েটা এবার ঘুরে ঘুরে সব টেবিলেই

সকলের কণ্ঠলগ্ন হচ্ছে। উলটোদিকে চেয়ার পেছনে ঠেলে বেশ খানিকটা দূরে অত্যন্ত চুপিসারে মিহির-রুবি নাকে নাক ঘষছে। আধপুরনো কোনো দম্পতির দিকে তাকালে প্রায়ই মনে হয় শুধু নারীর শরীরেই নয়, পুরুষের শরীরেও ব্যবহৃত হবার দাগ লেগে থাকে। স্বামীর চেহারাটা যেন আট-দাগী মিক্‌স্‌চারের শিশি। বারো মাস স্ত্রীর ব্যবহারের দাগ গলা থেকে পা পর্যন্ত। মাথার তেলে, গলার বোতামের ফোঁড়ে, গালের চর্বিতে পুরনো সোয়েটারের মতো হাতের চামড়ায় আর থুতনির ভাঁজে স্ত্রীর হাতের দাগ। মাঝে মাঝে চক্ষুষ্মান থাকতে অবসাদ আসে। সমীর খুব যত্নের সঙ্গে যখন চশমার ডাঁটি দিয়ে চশমাকে জোড় হাত করিয়ে টেবিলের ওপর তাকে ঘুম পাড়াতে ব্যস্ত, তখনই হঠাৎ নিজের কোলের ওপর অনুভব করল মেয়েটির উদোম উরুর ফ্যান-গালা ভাতের হাঁড়ির উষ্ণতা। সমীর তখন কমনীয়ভাবে দৃষ্টিহীন। চোখের ওপর হুগলী জেলার কোনো অখ্যাত গ্রামের বড় বিষণ্ণ পৌষ সন্ধ্যা। দধি গোয়ালিনীর ঘরের পাশেই পুকুরপাড়ে কে যেন উনুন ধরিয়েছে। হিমসন্ধের ভারি বাতাসে ধোঁয়ারা উঠতে পারছে না, হেলির ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো আদিগন্ত শুয়ে আছে। তিনটে পাতিহাঁস ঘাটে ফিরে এসেছে। তাদের কেউ খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে না দিলে নির্ঘাত শেয়ালে খাবে। এইসব লয় এবং প্রশান্তির ছবি নিয়ে মেয়েটির বাদামী কোমরে হাত বেখে ইংরিজিতে প্রশ্ন করে, খুকি তুই কি কেরালার মেয়ে? তোকে দেখতে ঠিক শার্লির মতো—

মাত্র আঠারো মাস আগে এই ভাইজাগেই এক মেঘলা সকালে নিউ বিম্‌লি রোডের পাহাড়ের গা বেয়ে সেই ধু ধু সমুদ্রতীরে সমীর শার্লিকে নিয়ে কত হুটোপুটি করেছে। পাহাড়ের গায়ের রাস্তা থেকে নিচে শাদা ফেনার জিভ বের করে ছুটে-আসা সমুদ্রের নীল ঢেউগুলো সোরেন্‌তো-কে মনে পড়ায়। আধ খাওয়া বিয়ারের বোতলে বৃষ্টি ঢুকে যাওয়ার ভয়ে বোতলের মুখে হাত চাপা দিয়ে বালি ভেঙে ভেঙে ছুট। মাত্র দু-তিন ঘর জেলেদের নারকোল পাতা ঢাকা ঝুপড়ি, তার মধ্যে কি শার্লিকে ধরে? কলকাতায় প্যাণ্ট কাচতে দেবার আগে প্যাণ্টের পকেটে বালি দেখে মালতী বলেছিল, ভাইজাগে বুঝি খুব ভালো বীচ আছে? আজও আনমনে পকেট উলটে অতীতের বালি ঝাড়ছে সমীর।

সত্যি বেবি, তোকে ঠিক শার্লির মতো। শার্লি ছিল কেরালার মেয়ে। শার্লির উরুতে কি ভয় আমার—মেয়েটি, উরু, ভয় ইত্যাদি সমূহ গীতাঞ্জলি বাদ দিয়ে একেবারে উটমক্কার মতো বলল—তুমি কি কেরালার ভাষায় কথা

বলতে পার? আমি কিন্তু আন্‌ধ্রার মেয়ে, মালয়ালাম জানি না।—কথা শেষ করেই মেয়েটি সিল্কের রুমালে বানানো ইঁদুরের মতো হাতের মুঠো থেকে পিছলে গেল। যাবার আগে ডান হাতে দূরগামী পাখির ডানার হিল্লোল তুলে মেয়েটা সমীরকে একটা উড়োন চুমোর বকশিস দিতে কিন্তু ভুলল না। সমীর খানিকটা নাবালক বেচারা-বেচারা ভঙ্গিতে হাত বাড়াবার একটা নিষ্ফল মুদ্রা দেখাল। আজকের স্মার্ট সমীরের এই গোবেচারা অঙ্গভঙ্গি দেখে অদূরে মিহিরের মনে পড়ল প্রায় ষোল বছর আগের আর এক বাচ্চা-বাচ্চা সমীরকে যেদিন ওর দাদা মারা যায়। সেই শীতের সন্ধে, চিৎপুরের ভিড় হাসপাতাল আর দশাসই চেহারার নারায়ণদা। কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারে নি এই স্বাস্থ্যবান আমুদে মানুষটা একদিনের হৃদরোগে হঠাৎ এইভাবে উবে যাবে। মাড়োয়ারি রিলিফ হাসপাতালে পাঁচতলার একটা বেডে শুয়ে ছিল মানুষটা। প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে চিৎপুর দিয়ে মিহির হাঁটছে তো হাঁটছেই। শীতের পড়ন্ত বেলায় এই জনস্রোত ঠেলা-রিকশা দোকান সব মিলিয়ে কেমন যেন কাশী-কাশী। দু পাশের দোকানগুলোর চেহারা আর গন্ধ একেবারে কাশী বসানো। পান জর্দা, আচার মেঠাই কম্বল কাঁসার সমন্বয়ে পুরো একটা বিশ্বনাথ গলি। তার সঙ্গে চকের মতো প্রচুর আলুর চপ দইবড়া শনপাপড়ি গজা মুগের লাড্ডু। আর একটু এগুতেই এক ঝাঁক ছোট ছেলেমেয়ের ভিড়। কারুর পায়ে জুতো নেই! রাস্তার ধুলো কাদা পানের পিচ আর থুতুতে মলিন সব শীতার্ত কচি পা। গায়ে প্রায় কারুরই গরম জামা নেই। অথচ কলকাতায় সেবার কি শীত। নেমন্তন্ন বাড়িতে পাত পাতার মতো একদল শিশু রাস্তার ধারে নর্দমার পাশে সারি সারি বসে আছে। সামনে তাদের কলা পাতার বদলে পুরনো বছরের বই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বই বিক্রি করছে তাদের নিচু শ্রেণীর ছেলেমেয়ের কাছে নামমাত্র দামে। কখন কখন দামও দিতে হচ্ছে না, শুধু ভাই-দাদা সূত্রে বিনিময় হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে নতুন বছরে নতুন বই কেনার সমস্যা মিটে যাচ্ছে। হাসপাতালের অদূরে একটা গুঁড়ো হলুদ আর গরমমশলার দোকানের পাশে সমীরের ছোট বোনটি মিলি আর ওদের পাড়ার পুটু একটা ছোলা গাছের ডাল থেকে টানাটানি করে সবুজ ছোলা ছিঁড়ে খাচ্ছিল। মিহিরকে দেখে কি করুণ একফালি হাসি মিলির। ছোটরা যেমন করে টের পায় শোকের সময় ঠিকমতো হাসতে নেই, আকাশে তেমনি বেমানান আলো যা প্রায় আলোর অজুহাত মাত্র। সেদিন লোহার বেড থেকে নারায়ণদার দেহটা যখন সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে তখন হাসপাতালের পরিষ্কার

সিলভার-গ্রে মজাইকের মেঝের ওপর বসে পড়ে সমীর হাত বাড়িয়ে ঠিক এইরকমই একটা অসহায় আতুর ভঙ্গি করেছিল। ছোটবেলায় রুগ্ন ছিল বলে সমীরের মা ওকে 'পচা হাজা' ছেলে বলতেন যাতে যমের নজর না লাগে। কিন্তু সেসব এখন অন্য জীবনের কথা হয়ে গেছে। এখন মিহির ও সমীর দু জনে দু জনের কাছে প্রায় আধচেনা কিংবা মুখচেনা। ভাইজাগে এলেও এখন আর সমীর মিহিরের সঙ্গে দেখা করে না, অথবা দেখা হয় না। মজা হচ্ছে একটা মানুষের সঙ্গে আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই-য়ের এক্কা-দোক্কায় দিব্যি তিড়িং তিড়িং লাফিয়ে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু একজনের সঙ্গে তুই থেকে আপনিতে ফেরা? দু জনের মধ্যে তখন কি বিরাট শবযাত্রার মিছিল। অসংখ্য কোমরে গামছা বাঁধা স্মৃতি যার লাশ (?) ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছে সে কেমন ছিল? সমীর এখন নিজস্ব ট্রে-তে আইস কিউবের মতো কঠিন ঠাণ্ডা। ভালোবাসার দৃশ্যে অসৎ অভিনেতার মতো বেমানান। মিহির খুব আন্তরিক গলায় মনে মনে কতবার বলতে চেয়েছে, তুই আমাকে এবার থেকে আপনি বলিস সমীর, সেটা বরং এই ছেঁদো অভিনয়ের থেকে অনেক ভালো! অথচ কারণটা কি হাস্যকর। সমীর যেদিন থেকে জেনেছে যে তার বাবার একজন রক্ষিতা আছে সেদিন থেকেই বাবার সঙ্গে সম্পর্ক খতম। অথচ রক্ষিতাটি যে মিহিরের বিধবা পিসিমা যিনি প্রায় আঁতুড় থেকেই মিহিরকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছেন। এক কথায় তাঁর মুখদর্শন বন্ধ করার মতো কোনো গনগনে ভাবালুতা তো মিহিরের থাকতে পারে না। তা ছাড়া সমীর তখন থেকেই ভালো চাকরি করত, অথচ মিহির তখনো অনেকটাই তার বড়লোক পিসিমার আশ্রিত···।···দুম দুম করে আবার ব্যাণ্ডে ঘা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমীর চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। বন্যার জল বাড়ার আগে অন্য কোনো উঁচু আশ্রয়ে পৌঁছুতেই হবে এমনি এক ভিটেমাটিহীন করুণ গলায় সে মিহিরকে শুধু বলল, প্লিজ। বিরক্তির এলোমেলো গুঞ্জন এবং সিগারেটের ধোঁয়ায় সাঁতরে ওরা যখন বাইরে এল আকাশ তখন মধ্যরাত্রির তারাদের সততায় নীল।

গাড়ির কাছে এসে মিহির যখন গাড়ির দরজা খুলে সমীরকে ওঠবার ইঙ্গিত জানাল সমীরের তখন হঠাৎ ধাঁ করে কেমন রাগ ধরে গেল। আমাকে আজ এত তোয়াজ করছে কেন মিহিরটা। হয়তো জাহাজে সাপ্লাইয়ের কনট্রাক্টটা তার কাছ থেকে ঝাড়বার তালে আছে। শালা, এত ফেঁতি ব্যবসাদার হয়ে গেছে। নখ দিয়ে ব্রণ খুঁটে ফেলার মতো একটা জঘন্য হাসি টেনে সে বলল, আমার সঙ্গে এত ভদ্রতা করছিস কেন রে?

মিহির কাঁধ ঝাঁকিয়ে কলার থেকে একটা উইচিংড়ে ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে বলল, কারণ আমরা দু জনেই ভদ্রলোক বলে। সমীর ঝাঁঝালো হাসিতে আরো দু ফোঁটা বিটার মিশিয়ে বলল, তাই নাকি? আর কিছু নয় তো? মিহির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা সামান্য একটু কামড়ে রুবির হাত ধরে গাড়ির দিকে টেনে নেয় এবং নিজে স্টেয়ারিংয়ে বসে। সমীর হাসতে হাসতেই ওদের পাশে বসে এবং ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে, রাগ করলি? তুই আজকাল বড্ড হিসেবি, বড্ড ভদ্র হয়ে গেছিস মিহির। মদ খেয়ে কখনো মাতাল হয়ে পড়িস না, ঠিকঠাক গাড়ি চালাস আবার ভদ্রতা করে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকিস— এত সব ভদ্রতা-ফদ্রতা ভালো লাগে না শালা। কি দরকার তোর মদ খাওয়ার?

একটা নিরুত্তর অন্ধকার কেটে শুধু গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায় আর সমীরের মাথাটা মাঝে মাঝে রুবির ঘাড়ের ঝোপে আশ্রয় চায়। নতুন বীচ রোডটা পেরুবার সময় হঠাৎ পিছনের হাফ ক্যাপটা খুলে একটা বিশ্রী ট্যাং ট্যাং শব্দ তুলে উলটো দিকের অন্ধকারে গড়িয়ে যায়। ব্লিংকারের হলদে আলো রুবির লালচে চোখে দিপ্‌দিপ্‌ করে। আলতো করে বাঁ দিকে পার্ক করে মিহির গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। বাঁ দিকের দরজা খুলে সমীরও ঝট করে নেমে দাঁড়ায়। বাইরে সমুদ্রের হাওয়া অঢেল সুস্থতায় ওকে স্নান করিয়ে দেয়। খোলা কাঁচের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে সে রুবিকে আহ্বান জানিয়ে বলে, এখন বাইরেটা কি মুখর, একটু নেমে দেখ রুবি। রুবি সেই আমেরিকান পেপারব্যাক সিরিজের মতো স্মার্ট ঝলমলে হাসি টেনে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। মিহিরও ততক্ষণে চকচকে হাফ-ক্যাপটা খুঁজে এনে টায়ারে লাগাচ্ছে। ব্যাকলাইটের আলো থেকে খানিকটা লাল অতীত তার মুখে। দূরে ডলফিনস-নোজের ওপর লাইটহাউস থেকে একটা তীক্ষ্ণ দিশারী আলো ঘুরে ঘুরে একবার রুবি একবার সমীরের মুখের মিটারে পথ চলার হিসেব পড়তে চায়, রুবির মিড-নাইট ব্লু আমেরিকান জর্জেটে তখন বড পাগল-করা বঙ্গোপসাগরের হাওয়া। একদিন কেরালার কাজুবনেও এইরকম উন্মাদ ঝোড়ো হাওয়া দেখেছিল সমীর এই অঙ্কের বেলাভূমিতে বসেই! রুবির পিঠ থেকে সরু কোমরের অবাধ ঢল নেমে গেছে বর্ষায় উত্তাল গেরুয়া গঙ্গার মতো। এ-সব অনেক দেখেছে সমীর। তবু প্রতিবার নতুন করে ডুবে মরতে সাধ হয়। মৃত্যুলোভের সঙ্গে যৌনতার কোথায় যেন একটা গাড়ল সংসর্গ আছে। রুবির দিকে সেতুবন্ধের মতো

উন্মুখ হাত বাড়িয়ে হঠাৎ প্রায় একটা চাপা চীৎকার করে সমীর, চলো সমুদ্রের ধারে আমরা একটু নাচি রুবি—

রুবির উত্তর দেওয়ার আগেই মিহির এগিয়ে আসে, খুব শান্ত অথচ জেদী গলায় বলে, আজ থাক সমীর, অনেক রাত হয়ে গেছে।

সমীর একটা বেহেড পাগলের মতো হাসে এবং হাসতে হাসতেই বলে, ভয় পেলি তো? ভাবছিস তোর বউটাকে ভাগিয়ে নেব, তাই না?

মিহির কিন্তু এবারেও দমে না, সিগারেট নিভিয়ে ফেলার মতো সহজ নির্বিকার গলায় সে শুধু প্রতিপক্ষকে দুমড়ে নিভিয়ে দিতে চায়।

সে মুরোদ তোর হবে না সমীর। হলেও তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তোর দুনিয়াটা বড্ড ছোট। শুধু তুই নয়, তোর মতো যারা বড় চাকরি করে তারা প্রত্যেকেই বোধ হয় এক। ভেবে নিস, বউকে টোপ দিয়ে, তোকে মদ খাইয়ে, গাড়ি করে ঘুরিয়ে, ক্যাবারে দেখিয়ে সকলেই বোধ হয় তোদের থেকে অর্ডার বাগিয়ে নেবার তালে ঘুরছে। ছকে ছকে যেই মিলে গেল—ব্যাস্। ওসব সিনেমা টিনেমায় চলে, জীবনটা তার থেকে—

শেষ করার আগেই মিহিরের ঠোঁটে আলতো একটা ঝাপটা মেরে সমীর বলে, ধ্যুস্, শা-লা, জ্ঞান দিস নি। আমার বড় নাচ পেয়েছে।

হয়তো ওর গলায় একটা ধাক্কা মারার জন্যেই মিহির হাত তুলেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে রুবি ওদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। মেঘ ভাসা শালুক ভর্তি একটা শান্ত দীঘির মতো ঐশ্বর্যময় গাঢ় গলায় সমীরের বুকে হাত রেখে বলে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে সমীর, লক্ষ্মীটি, আজ থাক না—। রাস্তা পেরিয়ে টলতে টলতে সমুদ্রের ধারে একটা বন্ধ মরা আইসক্রিম স্টলের দিকে চলে যেতে যেতে সমীর চীৎকার করে, তোমাদের নিদ্রা সুখের হোক, আমি নাচবো। রুবিকে জোর করে গাড়িতে উঠিয়ে মিহির দ্রুত নেমে যায় অন্ধকার সমুদ্রের দিকে। চারিদিকের প্রবল হাওয়া অন্ধকার আর সমুদ্র গর্জনের মাঝে দু হাত তুলে ট্যারাবেঁকা পায়ে সমীর একটা নাচের মুদ্রা করার চেষ্টা করে। পারে না। একমুঠো বালি খিমচে ধরে বেবাক পড়ে থাকে। মিহির তার পাশে হাঁটু-গেড়ে তাকে টেনে হিঁচড়ে কোনো রকমে বসায়। একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—আজ তোকে আমার একটা খুব জরুরি কথা বলার ছিল সমীর। সেটা চেপে রাখার জন্যেই এত মদ খেলাম। শুনবি কথাটা?

অনেক দিনের বন্ধ মরচে ধরা কৌটো খোলার মতো সমীর খুব জোর করে

তার লাল চোখ দুটো খুলল। ফিক করে একটু ভ্যাবাচ্যাকা হাসি দিয়ে বলল, বলেই ফেল।

মিহির বিন্দুমাত্র ভূমিকা না করেই বলল, পিসিমার টেলিগ্রাম পেলাম, আজ তোর বাবা মারা গেছেন।

মিহিরের দু-কাঁধ ধরে একটা তীব্র ঝাঁকানি দিয়ে সমীর কথা না জড়িয়ে একেবারে স্পষ্টভাবে বলল, এই এই, কি বলছিস, কি সব বলছিস তুই।

একটা মরা ইঁদুরের মতো নিজের মৃত ঠাণ্ডা পূর্বকথিত সংলাপটা মিহিব ফের সমীরেব চোখের সামনে শুইয়ে দিল।

আজ তোর বাবা মারা গেছেন।

সমীরের কানে কথাটা কেমন দূরাগত প্রতিধ্বনির মতো ভেসে এল। যে মানুষটার সঙ্গে গত পনেরো বছরে পনেরো দিনও দেখা হয়েছে কিনা মনে পড়ে না, সেই মানুষটা কি করে যেন মাটি ফুঁড়ে চোখেব সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। গোলগাল গিলেদার আদ্দির পাঞ্জাবি পরা। ঘন ভুরু আব চুলেব বাহারে কতকটা আগেকার অভিনেতা দুর্গাদাস ধরনেব—হুবহু সেই মানুষটা! কপালের বাঁ দিকে সেই জরুল আব গালে বসন্তের দাগটাও ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে একটা মস্ত স্পিকার ঝুলছে। ব্যস্ত বিমান বন্দরের ঘোষণার মতো কে যেন একটা খুব ভরাট অথচ আবেগশূন্য নিরুত্তাপ নির্বিকার গলায় কেবলই ঘোষণা কবে চলেছে, আমি তোমার বাবা। আমাব নাম শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায়। আমি তোমায় রোজ বিকেলে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতাম। শিবু ডাক্তার। রামকমল লেনে খোলা নর্দমার পাশেই কিলবিলে রুগীদের ভিড়ে তোমায় নিয়ে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে। তোমার বয়েস তখন আট। মাথাভর্তি বিষফোড়া। চান করানো যায় না, চুলে চিরুনি চলে না। বালিশ-বিছানায় রক্ত মাখামাখিব ভয়ে তোমার মা মাটিতে আঁচল পেতে তোমায় নিয়ে শুতো। তোমার যন্ত্রণা আর একঘেয়ে কান্নার মাঝে মাঝে ঘা-কতক লাগিয়েও দিত। তাতেও তোমার প্যানপ্যানানি থামত না। আজকের হে মহামানব শ্রীসমীরকুমার রায়, আমি ঘুমহীন, খুব ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে দেখতাম পঁচিশ পাওয়ারের ডুমে মোটা কাগজ বাঁধা একঘর নীল উগরোনো অন্ধকার পিঠে নিয়ে তুমি উঠে বসেছ আর ছোট ছোট হাতে চোখ রগড়াচ্ছ আর তোমার ক্লান্ত মা শাদা পাতায় এক ধাবড়া কালির দাগের মতো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে। আমি তোমাব বাবা শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায়, যিনি ঐ দৃশ্যের একমাত্র স্বত্বাধিকারী, নিজেব

মাগছেলের এঁদো ডোবার নাকানি-চোবানি খেতে খেতে আজ যাকে তুমি ভুলেই গেছ, কিংবা ধরেই নিয়েছ আমি মরে গেছি বহুকাল আগে, আর তোমার মা যিনি আড়াই বছর আগে মাঘ মাসের শেষ রাত্তিরে ঠিক সেই এক ধাবড়া কালির মতো বাথরুমে মরে পড়ে ছিলেন······আরে রাখো তোমার কচকচানি অনাথবন্ধু। তুমি নামের আগে শ্রীযুক্ত বল কেন হে? বাপ চোদ্দ পুরুষ শিখিয়েছিল বলে; তাই না? তুমি কি কিছুই ভুলতে পার না। অথচ ঘটনাটা হচ্ছে মানুষ মাত্রই পরস্বাপহারী, বিস্মৃতিজীবী। সব ছেলেই তার বাপকে খেয়ে বড় হয়। তবু শ্রীল শ্রীযুক্ত বলে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করার চেষ্টা যায় না কেন? আর তুমি তোমরা আমার জন্যে কে কি করেছ তার ফর্দ শুনিয়ে আমার আঁতে ঘা দেবার চেষ্টা, দয়া কাড়ানো—এটা খুবই ছেলেমানুষি, খুবই হাস্যকর অনাথবন্ধু। তুমি তোমার বাবাকে ভুলে যাও নি? তোমাদের চেয়ে মোটামুটি বড় ঘরের ছিমছাম সংসারের মেয়েকে বিয়ে করে হঠাৎ নিজেকে তোমার খাকি-ফতুয়া পরা বাবার থেকে আলাদা মনে কর নি? চেপটে থাকা ডি-হাইড্রেডেড মটরশুটির দানাগুলো গরম জলে পড়লে যে-ভাবে সবুজ হয়ে ফুলে ওঠে, ঠিক সেইভাবে বড় ঘরের বউ পেয়ে তুমি কত তাড়াতাড়ি ফুলে সবুজ হলে মনে পড়ে? বেহালার খোলা ড্রেন নিম্নমধ্যবিত্ত সংসার থেকে এক লাফে উঠে এলে কালীঘাটের দোতলায়। আসলে 'বিয়ে-থা'—এই 'থা'-টা কি জান? থা হল স্থান, ঘর সংসার, নিজের ঘর পাতা। এটাই তো স্বাভাবিক। বুড়ো বয়েস অবধি মায়ের দুধ খেয়ে কাটাতে পারলে তো দুনিয়ার কোনো খাদ্য সমস্যাই থাকত না। কিন্তু তা হয় না। বাঁচবার জন্যে খাটতে হয়, খাবার জন্যে খাটতে হয়, তারপর আবার নিজের পুষ্যিদের খাওয়াবার জন্যে খাটতে হয়। এইভাবে স্বার্থ ফিকির ধান্দাবাজী আর মুখের ফেকো উড়িয়ে হেঁটে খেটে জান যখন লবেজান তখনো কি বাপচোদ্দপুরুষের ঋণ মনে রাখা সম্ভব অনাথবন্ধু? যে বলে সে ড্যাম লায়ার, ভণ্ড। বহুকাল আগে আমি তোমার জন্যে ছোটনাগপুর থেকে এক বোতল খাঁটি চাকভাঙা মধু এনেছিলাম। আমার বউ সেটা খুলে আমার পাতে দিতে আমি প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু গরম লুচির সঙ্গে মধুটা খেয়ে এত ভালো লেগেছিল যে আধ-খাওয়া মধুর বোতলটাও তোমায় দিতে পারি নি।···

পরের সকালে মিহিরদের বাড়িতে সমীর যখন চোখ খুলল তখন আর কোনো হ্যাংওভার নেই, চোখ শাদা। শুধু বাইরের বাতাস বড় এলোমেলো।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। জোলো হাওয়ায় লাল বোগনভালিয়া লতাটা বৃষ্টির নথ পরে দুলছে। মিহির ঘরে আসতে সমীর দিনের প্রথম কথাটা শুরু করেছিল মেলার ভিড়ে বাবার হাত-ফসকে হারিয়ে যাওয়া কোনো শিশুর একলাটি কান্নার মতো।

তোদের এখানে ভালো মধু পাওয়া যায় নাকি রে? ভাবছি যাওয়ার আগে তোদের ওয়ালটিয়ারের সমুদ্রে কিছু মধু ঢেলে যাব, দেখবো জলটা মিষ্টি লাগে, না নোনতা।

একটি মধ্যবিত্ত দিন

দীপক ভাবছিল তারাপদর নিশ্চয়ই আমার কবিতা ভালো লাগে না। কিন্তু আমার মতো বাল্যবন্ধুকে কাগজ থেকে একেবারে বাদ দিতেও হয়তো ওর ভদ্রতায় বাধে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার কাছ থেকে কিছু বেঁটে খাটো গল্প চায়। কিন্তু তাই বা কে চায়। তবু তো তারাপদর প্রাণে দয়া আছে ('দয়া' শব্দটা কি বাংলা !)।

দীপক লিখবে বলে যখন সবে কলমটা খুলছে সামনে বউমা এসে দাঁড়াল। সেই হেমন্তের বিকেলের মতো বিষণ্ণ নির্জন মুখ। চোখের কোণে কালি। রক্তহীন শাদাটে ঠোঁট। চিবুক আর কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। তবু চোখে এবং আরো কোথাও কোথাও কি এখনো কোনো সৌরভ আছে মালার। বাসি মালার কি গন্ধ থাকে না ! কী রকম যেন লাগে দীপকের। মনে মনে অনেক করুণাময় গলার প্রায় অনুনয়ের মতো জিগেস করে, মালা এখন কি তুমি রোজ দুধ খেতে পাও। এখন কিন্তু তোমার রোজ দুধ খাওয়া বড় দরকার। মুখে কিছুই জিগেস করতে সাহস পায় না। কারণটা মালাও জানে, দীপকও জানে। মালা জিগেস করে, কি লিখছ গো।

দীপক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আনমনা ভাবে উত্তর দেয়, লিখছি না, লিখবো। একটা গল্প।

মালা ছোট্ট উজ্জ্বল একটুকরো হাসি টেনে বলল, এবার একটা খুব সুন্দর গল্প লিখবে, কেমন।

রাত্রিবেব অন্ধকারে দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া সিগারেট যে ভাবে মুখে আগুনের ফুলকি তুলে ঝরে পড়ে, মালার হাসিটা তেমনি। যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার জন্যেই হঠাৎ ফুলকি তুলে নিভে গেল। কলম বন্ধ করে ওকে একটু তাতিয়ে দেবার জন্যেই দীপক বলল, মালা, তোমার সামনে বসলেই মনে হয় আমি যেন একটা এয়ারকণ্ডিসাণ্ড ডাক্তারের চেম্বারে বসে আছি। সবকিছু এত নিস্তব্ধ, ঠাণ্ডা যে ভয় হয় এখুনি হয়তো ডাক্তারবাবু বলবেন আমার ক্যান্সার হয়েছে, বাঁচব আর মাত্র সাড়ে বাষট্টি দিন। একটু ইয়ার্কি ঠাট্টার মতো হাতের কাছে দু-একটা সিনেমা

পত্রিকাও নেই যে মনটাকে একটু ব্যস্ত রাখব। একটা রাগী মাছি-মশাও নেই যে মারবার জন্যে হাতটা নিসপিস করবে। তুমি কেন যে সব সময় মুখ হাঁড়ি করে থাক।

আবার তেমনি ম্লান হেসে মালা বলল, তোমার বুঝি খুব এয়ারকণ্ডিসাণ্ড ঘরে বসা অভ্যাস।

এবার দীপকও সেই আধো অন্ধকার ভোরে চলন্ত ট্রেন থেকে দেখা একটা সরু নদীর রেখার মতো হেসে উত্তর দিল, ঠাট্টা করছ? শেষ পর্যন্ত তুমিও ঠাট্টা করলে আমায়। জ্ঞান সেবার বিছানায় শুয়ে শুয়ে দিদির যখন বেড়সোর হয়ে গেল, ভেবেছিলাম এই গরমে ঘামে দিদিটার কত কষ্ট, একটা পাখা কিনি। ইন্‌সটলমেণ্টের একটা কিস্তি জমাও দিয়েছিলাম। কিন্তু পরের কিস্তিগুলো বাকি পড়ায় পাখাটা শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে হয়েছিল। আসলে সত্যিই দিদিকে নিয়ে যখন ডাক্তারের চেম্বারে যেতাম সেই আরামের এয়ারকণ্ডিসানে বসে বসে মনে হত যেন সশরীরে স্বর্গে যাচ্ছি। আর নিতান্ত একটা বদ বাটপাড়ের মতো ভাবতাম, ভাগিস দিদিটার অসুখ করেছিল তাই না দু দণ্ড এমন তোফায় বসতে পারছি। রোগ, ডাক্তার, চেম্বার ইত্যাদি শুনতে শুনতে মালা কেমন আনমনা হয়ে গিয়েছিল। দীপকের শেষের কথাগুলো তেমন শুনতে পায় নি। শুকনো পাতার ওপর চলতে চলতে নিজের পায়ের শব্দই শুনছিল মালা। কাল আবার ওকে সেই গাইনির চেম্বারে যেতে হবে। ক্যাকাসে নির্জীব প্রসূতির মতো মঙ্গলবারের সন্ধে। তারই মতো সারি সারি কত পেট-ভর্তি মেয়েরা বসে আছে। ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন তাদের! বেশ মনে পড়ে বিয়ের পরেই একবার মালা দীপকের সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটে বেড়াতে গিয়েছিল। ওখানে একটা মস্ত রুটির দোকানে ঢুকে একটা দৃশ্য দেখে ভয়ে ভয়ে ওর ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রিক আভেনের পেটের ভেতর একগাদা আধা তৈরি রুটি বেরুবার পথ খুঁজছে। কিন্তু পাওয়ার ফেল করায় সব বন্ধ অজস্র অপরিণিত ভ্রূণের মতো গর্তের মধ্যেই মৃত হয়ে রুটিগুলো দিন গুনছে। ওদের সব ফেলে দিতে হবে। মালারও হয়তো এবার নিয়ে তিনবার নষ্ট হয়ে যাবে। একটা গোল চকচকে কান্নার বিন্দুর ওপারে দীপকের মুখটা গঙ্গায় ভেসে যাওয়া ফুলের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে কত দূরে সরে গেছে। এবারেও যদি ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বলে, স্যরি।

পিছুটান

বামুন বাদল বান, দক্ষিণে পেলেই যান। বামুনকে দক্ষিণে দিলেই সে চলে যায়। দক্ষিণে হাওয়ার জোর থাকলে বাদলের মেঘ ভেসে যায়, বান নেমে যায়। আকাশের দিকে তাকিয়ে এমন কথাই ভাবছে সোমনাথ। সারাদিন কালো মেঘ আর টিপ-টিপ বৃষ্টি। অথচ ক্যালেণ্ডারের হিসেবে শরৎ এসে গেছে কানায় কানায়। জাহাজটা কাল ভোর রাতেই চলে যাবে। অথচ এই বৃষ্টিতে কি করে যে মাল তোলা শেষ হবে কে বলতে পারে। গাঢ় ছাই রঙের আকাশের তলায় জাহাজের মাস্তুলে বাঁধা ব্লু-পিটার উড়ছে বিদায়ের নীল হাতছানির মতো। কে বলতে পারে এ জাহাজটা আর কোনোদিন এই বন্দরে ফিরে আসবে কিনা। এখনো জাহাজের গায়ে বড় বড় গাধা বোট বাঁধা। মার্কিন দেশের জন্যে ঠাসা প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা কার্পেট বাকিং রোল উঠছে। ভারতীয় ঘামে ভেজা এইসব পাটের রোলের ওপর অ্যামেরিকান মেশিনে কার্পেট বোনা হবে, যা নাকি একদিন শোভা পাবে বেভারলি হিলসের কোনো কোটিপতির মেঝেতে। জাহাজের গায়ের উজ্জ্বল রুপোলী রঙের পাশে বোটগুলোর মরচে-ধরা কেলে রঙ কী ভীষণ বেখাপ্পা। তবে বোটের ওপর মাঝিদের একটা মুরগির রঙ দারুণ দগদগে। পায়ে দড়ি বাঁধা একটা মোটা-সোটা লাল-কালোয় মেশা মুরগি রতিপটিয়সী নারীর মতো দিব্যি ইতিউতি ঘাড় নাড়ছে। এজেন্টের বুড়ো গোব্রিয়েল সায়েব বললেন, ঐ যে মুরগিটা দেখছ, পেনংয়ের বোটে ঠিক ঐভাবে মাঝিদের বাচ্চা বাঁধা থাকে। কেউ ওদের দেখবার নেই। পায়ের লম্বা চেন টেনে টেনে বাচ্চাগুলো সারা বোটে থুপ-থুপ করে ঘুরে বেড়ায়।

সারাদিন প্রায় বৃষ্টিকে থাবড়া দিয়ে মাল তোলার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু লাভ হয়েছে কলা। সুতরাং জাহাজের সেলিং পেছুতে বাধ্য। এত মাল হাতে পেয়ে কোনো বুদ্ধু জাহাজ হটাবে। পরের দিনই খটখটে রোদ আর আশ্চর্য নীল আকাশ। ফলে, ভোর থেকে নাকে দড়ি দিয়ে খাটুনি। সারাদিন নাওয়া-খাওয়ার সময় পায় নি সোমনাথ। এদিকে আবার ক্যাপ্টেন বায়না করেছে, তার কিছু কেনাকাটা সারতে হবে। এক ফাঁকে নাচার সোমনাথকে

গ্যাট-গরচা দিয়ে ট্যাক্সি নিতে হয়েছে। এ জাহাজেই অনেক হিউম্যান স্পিসিজ অর্থাৎ কঙ্কাল শিপমেণ্ট হচ্ছে। সোমনাথ জানে খুব চড়া দামে ওগুলো বিদেশীরা কিনে নেয়। তবু ইয়ার্কি মেরে ক্যাপ্টেনকে দাম জিগেস করতে সে বলেছিল, একটা কঙ্কালের দাম দশ হাজার টাকাও হতে পারে। ক্লান্ত সোমথাথ মিচকি হেসে বলেছিল, সাহেব তুমি হয়তো জান না, যে মানুষটার কঙ্কাল আজ তুমি দশ হাজার টাকায় কিনে জাহাজে তুলছ, সে মানুষটা জ্যান্ত অবস্থায় হয়তো দশটা টাকাও এক সঙ্গে চোখে দ্যাখে নি। ক্যাপ্টেন কিন্তু ও-সব ঝামেলার কথায় কান না দিয়ে স্রেফ বুড়োরা যে রোগে ভোগে সেই রোগেই ভুগছিল। অর্থাৎ স্মৃতির পরীক্ষা দেওয়া। গড়গড় করে বলে চলেছে, ঐ দ্যাখ গঙ্গা আর হাওড়া ব্রিজ, ওটাই তো ফোর্ট উইলিয়াম, আর এটা সেই ইডেন পার্ক মনে হচ্ছে। ওখানেই তো অকল্যাণ্ডের স্ট্যাচুটা ছিল। জানি, ওটা তোমরা উড়িয়ে দিয়েছ। আমরা কিন্তু এবার ওটাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাব। আমার হোম টাউনের নাম ঐ অকল্যাণ্ডের নামেই, আর ওখানেই ওটা দাঁড় করানো হবে। এক চুমুক ভাবল সোমনাথ —মূর্তিটা যে আমরা উপড়ে দিয়েছি তার জন্যে কোনো বিষ নেই তো ব্যাটা ইংরেজের মনে। সায়েব তখনো গঙ্গাজলের ফাটা পাইপের মতো গল-গল করছে, দ্যাখ ময়দানে কত গাছ হয়েছে। আমার বেশ মনে আছে, আগে কিন্তু একটাও গাছ ছিল না। তার কত পরে ওগুলো পোঁতা হল। ওদের আমি কত ছোট দেখেছি আর আজ ওরা কত বড় হয়ে গেছে…।

কতকাল আগে সোমনাথও তার বোনটিকে কত ছোট দেখেছে। আজ কি সে সত্যিই বড় হয়ে গেছে, অনেক? ক্লান্ত সোমনাথের মতোই খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে কত যুগ পরে যেন শরৎ এল। অথচ এই তো সেদিন, রাত্তিরে যাত্রা শুনে ফেরার সময় হিম পড়ে মাথার চুল চটচটে। আঁচলে আলতো করে মা মুছিয়ে দিলেন। এত রাতেও কেন যে মায়ের গা-ধোয়া হয় নি। তখনো চুল বাঁধা আশ্বিনের বিকেল মায়ের তাঁতের শাড়িতে। নারকেল-কুরোর মতো এক কলাপাতা মেঘ ছড়ানো আকাশ সরে গেল।

আরে মশাই, আর কিছু না পারুন শেডের মালটা অন্তত উঠিয়ে নিন, না হলে বড্ড বেইজ্জতি হয়ে যাবে। কেরানির কথা শুনে রাগে মাথার মধ্যে দপদপ করে সোমনাথের। শালা, ইচ্ছে করে আমরা মাল ওঠাচ্ছি না। এই সরু ভাঙা কী-লাইন, একটা ক্রেন পর্যন্ত নেই, জাহাজের বুড়ো নড়বড়ে ডেরিকই একমাত্র সম্বল। আর মাল বলতে ঐ বিরাট লম্বা লম্বা লোহার টিউব।

পঞ্চাশবার জাহাজ থেকে শেডে নামা-ওঠা করতে-করতে জান্ হালকা, জিভ শুকিয়ে কাঠ। ধ্যাৎ, ঠিক বিকেলেই কেন যে জ্বর আসে। হাঁটতে শিখে বোনটিটা বড় পাজি হয়েছে। কোথায় কোথায় যে ঘুটঘুট করে বেড়ায়। কে কাঁদাচ্ছে রে···ঠিক সমু নিশ্চয়ই···বুড়ো ছেলে, বোনটিকে কাঁদাতে···। তুমি রান্নাঘর থেকে অমন চেঁচাচ্ছ কেন, আমি অত চেঁচিয়ে কথা বলতে পারছি না···। চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও উপায় নেই। খিদিরপুর ডকের এই সেকশানে আর একটাও কর্কলিফট খালি নেই। কুল্লে ঐ একটি দিয়েই এতগুলো পেটি বার করতে হবে। সময় যাচ্ছে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। পুলিশ ইনস্পেকশান হয়ে গেছে। আর এক মিনিটও এখানে কোনো মেয়ে রাখা সম্ভব নয়। ডেক থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, তু নম্বর অফিসারটা একটা মেয়ের পাতলা কোমর জড়িয়ে গ্যাংওয়ে দিয়ে নেমে যাচ্ছে। মেয়েটার ঢলানিপনা আর থামে না। সতীলক্ষ্মীর বরকে ছাড়তে যেন বুক ফেটে যাচ্ছে।···ও মেয়েকে বিয়ে করলে তুই আমার মরা মুখ দেখবি। না, তার আর দরকার হয় নি। সোমনাথ নিজেই সরে এসেছে। কেয়ার জন্যে কতকাল সে মায়ের গন্ধ ছাড়া। একজনকে পেলে আর একজনকে কি ছাড়তেই হয়! দশটা বছর দশ ঘণ্টার মতোই কোথা দিয়ে ফুড়ুৎ। রক্তের মধ্যে একটা তিনটে চারটে কি বিষণ্ণ হেমন্তের বিকেল বাসি হয়ে গেছে। অথচ একটা লিকপিকে ঘাস ফড়িং কত সহজে সেগুলো তার ডানায় নিয়ে কেয়া বনের সুবাসে উড়ে গেল। উড়ে গেল সময়।

আর দেরি করলে সেলিং টাইম পেরিয়ে যাবে, তা হলেই চিত্তির। ক্যাপ্টেন এখন আর সেই ক্ষমা-সুন্দর শিবঠাকুরটি নেই। রেগে ঠকঠক করে কাঁপছে। ফলে কিছু পার্পেট-রোল ছেড়ে দিয়েই হ্যাচ বন্ধের চেষ্টা দেখতে হল। কোত্থেকে একটা ভাঙা ধড়ধড়ে জাহাজ এনে আমাদের ওপর লপচপানি। এক হ্যাচেই চার চারটে ডেকের সমস্ত বিম আর রাজ্যের কাঠের ফলকা ঘাটে ঘাটে লাগিয়ে বন্ধ করা কি ইয়ার্কি নাকি। তাও ক্রেন নেই, স্রেফ ঐ ভেড়ুয়া উইঞ্চ। গায়ের চামড়া সাদা নয়, তাই মুখ বুজে সব হজম করতে হচ্ছে। অন্য দেশ হলে পেঁদিয়ে শুয়োরের বাচ্চাকে বৃন্দাবন দেখাত। প্রচণ্ড ভারি বিমগুলো মাথার ওপর দুলছে। উইঞ্চের এক ঝটকায় লাফিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসছে শূন্যে। তার পর আর কিছুতেই তাদের বাগে আনা যাচ্ছে না। নিজের ভারেই যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছে। কিছু ঝানু সর্দার আর জনা তিরিশেক মানুষ মরীয়া হয়ে সারা ডেক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রচণ্ড শক্তিতে সবাই মিলে প্রায় বিমের

দড়ি ধরে ঝুলে পড়তে চায়। ছিঁড়ে মাথায় পড়লে চিঁড়ে চ্যাপটা। আমেরিকার র‍্যাঞ্চে দুর্দান্ত বুনো ঘোড়া বশ করার দৃশ্য। তার পর এক সময় সব ঠাণ্ডা, খতম। জাহাজ থেকে নেমে শেডের পেছনে রেল লাইনের দিকটায় একটা পেটিতে ঠেস দিয়ে একলাটি খানিক চুপ করে বসে থাকে সোমনাথ। চারিদিক এখন খালি ডাবের ভেতরটার মতো নিস্তব্ধ। পা থেকে কাঁপুনি উঠে ভীষণ শীত করছে। ট্যাক্সিতে চোখ বোজে সোমনাথ। সাত সকালে বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনের তারে ল্যাজঝোলা কে এল রে সোনারপুর।

বিশাল নিমগাছটা এখানে তেমনি মাটির উঠোন থেকে বাড়ির অর্ধেকটা ছাতা ধরে আছে। উঃ কি ঠাণ্ডা হাওয়া, বেলা এগারোটার রোদও গায়ে লাগে না। কান-মাথা মুড়ি দেওয়া সেই বাচ্চা বাচ্চা সকালগুলো কোথায় যে গেল। কেয়াটা এমন ভুলো না, একটা চাদর-টাদর···। শেষ পৌষের পেটে প্রথম বাচ্চা-আসা টের-পাওয়া একটা আইবুড়ো সকাল। যেন এখন আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না এমন থমথমে। বুকের উঠোনে কতক্ষণ একা দাঁড়িয়ে সমু। কেউ নেই, কেউ আসছে না। রোয়াকের সবুজ দরজাটা তো হাট। কড়া নেই, তাই কড়া নাড়ারও বালাই নেই। তা ছাড়া নিজের বাড়িতে নিজেই কড়া নাড়তে কেমন পর পর লাগে। হাওয়ার তোড়ে ঝরা নিমপাতায় ঘাড়-মাথা ভরে যাচ্ছে। বোনটি এখন মাথায় কত বড়টা হবে? শাড়ি পরে নাকি? ধ্যুৎ। উঠোনে কাঁথা শুকোতে দিয়েছে। তাতে জুলজুলে আলোছায়ার চিতাবাঘ শুয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা টনটন। আলোছায়ার চিতাচিতাবাঘের কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। একদম চোখ বুজে। ছোটবেলার মায়ের কাছে যেমন। কপালে চুলে গালে সোনালী নিমপাতা ঝরা টের পাওয়া অথচ ঘুম—মা-ও তো তেমনি।

দুপুর গড়িয়ে

নাইলনের মসৃণ মশারির মতো, কুয়াশায় ঢাকা ভোরের কলকাতা। মাথাটা টিপটিপ করছে। নিশ্চয়ই জ্বর এসেছে সুমন্তর। জিনিয়া বেরিয়ে গেছে আরো অনেক ভোরে। এখন তো সে তুলনায় অনেক বেলা। উজ্জ্বল রোদ আর হাওয়া। চোখ চাওয়া যায় না এত চোখ জ্বালা করছে। সুমন্ত শুয়ে শুয়েই ঠিক করে নেয় জিনিয়াকে ফোন করবে। একটু পরে পন্টুর দোকান পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সত্যিই ডায়াল করে সুমন্ত। তার আগের মুহূর্ত অবধি বেশ ভয় হচ্ছিল। কে ফোন ধরবে কে জানে। হয়তো দু-কথা শুনিয়ে দেবে। সারাটা সকাল তেতো হয়ে যাবে। না, যিনি ফোন ধরেছিলেন তিনি মোটেই ব্যস্ত, বদরাগী ধরনের নয়। বরং একটু বেশি বিনয়ী। বললেন, জিনিয়া নিচের মাঠে আছে। আসতে একটু দেরি হতে পারে। সুমন্ত ফোন ধরে থাকে। সুমন্তর চোখের ওপর তখন একটা বিরাট সবুজ মাঠ ভাসছে। সেই মাঠের দূর প্রান্ত থেকে দু-তিনটি গভীর বাঁক-কাটা দীর্ঘ শরীর লঘু পায়ে হেঁটে, ক্রমে দৃষ্টির ফ্রেমে বড় আরো বড় হয়ে এগিয়ে আসছে। পরনে মাঠেরই মতো প্রথম বর্ষার জল-পাওয়া নতুন ঘাসের মতো শাড়ি। যেন সারা গায়ে মাঠ জড়িয়ে জিনিয়া এগিয়ে আসছে। সবুজে সবুজে সব একাকার।

ফোনটা যেখানে নামানো আছে নিশ্চয়ই তার কাছেই খোলা জানলা। আশপাশের নানা শব্দ রিসিভারে ধরা পড়ছে। দূরের কোনো গাছে একটা কোকিল ডাকল। তার মিলিয়ে যাওয়া একটা নীলচে প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে। রাস্তায় অপস্রিয়মান গাড়ির হুটারের শব্দ। এমনিতে যে-সব শব্দ কানে লাগে, দূর থেকে ভেসে আসার দরুণ তা-ই কত কোমল, স্বপ্নিল। জিনিয়া ফোন ধরল। কি ভরাট গলা জিনিয়ার। পাড় অবধি জল-উঠে-আসা দীঘির মতো টইটম্বুর। মেয়েদের একটু ভারি গলা সুমন্তর খুব পছন্দ। কিন্তু কি বলবে সুমন্ত। তেমন দরকারী কথা হয়তো কিছুই নেই। তবে কাছে থাকলেও কাউকে চিঠি লিখতে বা ফোন করতে বেশ লাগে। কেমন একটা বান্ধবী-বান্ধবী মনে হয়। জিনিয়া যেন জানত সুমন্ত ফোন করছে। একটুও অবাক হল না। হ্যালো বলল না। স্রেফ বলল, কি বলছ। সুমন্ত একটু

আহত হল। জিনিয়ার গলায় অন্তত একটু খুশি আশা করেছিল সে। সুমন্তও সোজা জিগেস করল, আজ কখন ফিরবে তুমি। তেমনি শুকনো অকেজো গলায় উত্তর দিল জিনিয়া, কেন, যেমন রোজ ফিরি। সন্ধে ছটা-সাতটার মধ্যে। জ্বরের কথাটা বলতে কেমন লজ্জা পেল সুমন্ত। নিজের অসুখের কথা বলে দয়া কাড়বার চেষ্টাটা বড় জোলো ব্যাপার। বরং অনুরোধ করল, আজ রোববার তো, বড় একলা লাগছে। আজকের দিনটা একটু তাডাতাড়ি আসতে পার না।

একটু ম্লান হেসে জিনিয়া বলল তুমি কোথা থেকে ফোন করছ। নরম সুরে প্রশ্রয় পেয়ে সুমন্ত চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, গ্যাখ না, প্লিজ, একটু তাডাতাড়ি যদি···। ওকে প্রায় থাবড়া মেরে থামিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে জিনিয়া বলল, কি ছেলেমানুষি আবদার আরম্ভ করেছ বল তো। রোগের আবার রোববার আছে নাকি (সত্যিই রোগের কোনো রবিবার নেই, তা না হলে ঠিক তাল করে রবিবারেই সুমন্তর জ্বর আসবে কেন !)। ওরা আমাকে টাকা দেয় কি মুখ দেখে ! তুমি কোত্থেকে ফোন করছ, জয়াদের বাড়ি থেকে ? ওকে বোলো ওর বইটা আমার পড়া হয়ে গেছে। ফেরার পথে ফেরত দিয়ে যাব। রাগ চেপে সুমন্ত বলল, আমি জয়াদের বাড়ি থেকে ফোন করছি না। পল্টুর ওষুধের দোকান থেকে ফোন করছি। ঠিক আছে, ছাডছি। একটু নরম সুরে জিনিয়া বলল, তুমি রাগ করছ। কিন্তু আমি কি করতে পারি বল। সোমাকে নিয়ে তুমি একটু বেডিয়ে এস না। বেচারার কোথাও যাওয়া হয় না। একটা কথা বলব, রাগ কোরো না। পল্টুকে একটু জিগেস করবে ওই চুলের টনিকটার দাম কত। কিনতে হবে না। আর গ্যাখ, আমি না চাবিটা বোধহয় আলমারিতে লাগিয়ে এসেছি। ওটা তুলে রেখো। ঠিক আছে, ছাড়ছি। অনেক সময় টেলিফোন কেটে গেলে মনে হয় সকালটা ঝুপ করে বিকেল হয়ে গেল। বয়েসটা টপ করে বুডিয়ে গেল। অথচ এর কোনো মানে নেই। কোনোই দোষ নেই জিনিয়ার। নার্স জিনিয়াকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছে সুমন্ত। আজ তা নিয়ে গুঁইগাই করা সাজে না। তবু তো এখন জিনিয়া রাত ডিউটি প্রায় করেই না। সামান্য জ্বর কি কারুর হয় না।

সুমন্ত বাড়ি ফিরে দেখে সোমা তখনো মন দিয়ে স্কুলের ব্যাগ গোছাচ্ছে আর নিজে স্কুলের 'মিস্' হয়ে অদৃশ্য ছাত্রদের বকছে। কাছেই রোদে পিঠ দিয়ে চারুর মা দুধের গেলাস নিয়ে সমানে বিড়বিড় করছে। সোমার একমাথা

উমনো-ঝুমনো চুলগুলো দেখে সুমন্তর হঠাৎ মনে পড়ল, জিনিয়ার অনেক দিনের শখ সোমাকে একটা সাহেবী চুল বানানো সেলুন থেকে চুল কাটিয়ে দেবার। কোনো ছুটির দিনেই হয়ে ওঠে না। ছুটির দিনগুলো ওই সব চুলকাটা, ধোবার কাপড় লেখা, কলের মিস্ত্রি ধরে আনা ইত্যাদি পরমরমণীয় কাজ নষ্ট করতে মোটেই ভালো লাগে না সুমন্তর। অথচ ওইগুলো না করেই বা উপায় কি। কিন্তু ওই সব মেমসায়েবদের সেলুনে যেতে সুমন্ত আসলে মনে মনে একটু ভয় পায়। অবিন্যস্ত বেশবাস একতাড়া মেয়ের মধ্যে তাকে যদি ঢুকতে না দেওয়া হয়। কিংবা যদি বিশাল একটা টাকা চেয়ে বসে। পকেটে ঠিক কত থাকলে ওসব জায়গায় ঢোকা যায় তার কোনো ধারণা নেই সুমন্তর। আর সে ভেতরে না গেলে সোমা কিছুতেই যাবে না! দ্বিতীয়ত, চুল কাটার পর টাকার অঙ্ক দেখে, টাকা না দিয়ে চুল ফেরত নিয়ে তো চলে আসা যায় না।

তবে এতদিনে জয়ার মেয়ে অনুরাধার কাছ থেকে একটা হদিশ পাওয়া গেছে। পার্ক স্ট্রিটের উত্তর-দক্ষিণে নাকি অনেক ক-টা দোকান আছে। টাকাটাও এমন একটা কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার না। চুল কাটার সময় প্রায় শেষ পর্যন্ত সোমা বেশ ভালোই ছিল। ওঠবার সময় কিন্তু একচোখ জল। নিজের কোলের ওপর পড়ে থাকা নিজেরই বড় বড় চুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, চুল কেটে নাকি ওকে একদম বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। অবাক ভীতু-ভীতু চোখে দোকানের চারিদিকটা একবার দেখল সোমা। জামায় চুল ছিল বলে চীনে মেয়েটা সোমার ফ্রকটা খুলে ঝাড়তে লাগল। সোমার ভেতরের জামাটা যেন বেশি মলিন। কাঁধের কাছে একটু ছেঁড়া। গলায় নোংরা সুতোবাঁধা টিনের তোবড়ানো মাদুলি। রোগাটে মুখে কান্না-ভরা দুটো ছলছলে চোখ। অথচ পাশের বাচ্চাটার কি সুন্দর সাদা পালকের মতো নেটের ফ্রিল দেওয়া জামা। হাতে মস্ত একটা খাঁটি ব্লণ্ড ওয়াকিটকি। ধ্যুৎ, এ-সব দামী সেলুনে না এলেই ভালো হত। হালকা গোলাপী প্লাস্টিক পেণ্ট দেওয়াল, শাদা স্প্রে করা চেয়ার-টেবিল, টেবিলে টেবিলে সোনালী ফ্রেমের বড় বড় বেলজিয়াম আয়না, চারিদিকে দামী ডিমের শ্যাম্পু আর ট্যালকমের মিষ্টি গন্ধ—এ-সবের মধ্যে রোগাটে, নোংরা জামা-পরা, কান্নায় কাজল-ধ্যাবড়ানো চোখের ছোট্ট সোমাকে বড্ড করুণ রকম বেমানান লাগছে। কেউই দেখে নি, তবু সুমন্তর মনে হল দোকানের সব মেয়েরা সোমাকে দেখছে। হয়তো ওরা বেরিয়ে গেলেই চিরুনি-কাঁচি সব ডিসইনফেক্ট করবে।

হঠাৎ দোকানের সব মেয়েগুলোর উদ্দেশে অশ্লীল উক্তি ছুঁড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হল স্থমন্তর। সামলে নিয়ে পকেটে হাত ভরে নোট বের করল স্থমন্ত। নোটগুলোর রক্তের দাগের মতো কি সব লেগে। তার ওপর যেমন কালো, তেমনি পচা। নোটগুলো স্থন্দর ম্যানিকিওর করা নোখের ডগায় চেপে, কাউণ্টারের মেয়েটা একবার স্থমন্তকে আপাদমস্তক এমন চোখ কুঁচকে দেখল, যেন নোংরা নোটগুলো স্থমন্তই তৈরি করেছে। এবার সত্যিই মুখ ফসকে একটা খিস্তি বেরিয়ে আসছিল। হাঁচি চাপবার মতো সেটাকে চাপা দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো স্থমন্ত। ভেতরের সেই ঠাণ্ডা অভিজাত অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁ ঝাঁ রোদে প্রথমটায় তাকানোই যায় না। তার ওপর মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কলকাতার সমস্ত বিলাসী দোকান বাড়ি রেস্টুরেণ্ট—সব কিছুই কেমন চিক-ফেলা অন্ধকার অন্ধকার। অন্ধকারটা তা হলে কি আভিজাত্যের লক্ষণ। কেন, বাইরের আলো, হাওয়া, ঝড়-জল— এরা সবাই কি খুনী টাইপের নাকি? তা না। আভিজাত্য মানেই আরাম। ওসব বাইরের উটকো ঝামেলা ঘরে ডেকে আনতে স্থখী লোকেরা পছন্দ করে না।

সোমা ঘুমিয়ে পড়ার পর সারা তুপুর কিছুই করার থাকে না স্থমন্তর। তু-একবার জল খাওয়া, তু-একটা সিগারেট টানা ইত্যাদি সময় কাটাবার নিয়মগুলো ঠিক সহ্য হয় না। জানলা থেকে তখনো রোদ ঘুরে যায় নি। পুব দিকের জানলা। সেই ভোর থেকে শেষ তুপুর পর্যন্ত রোদ থাকে। ভোরবেলা জিনিয়া যখন উঠে যায়, বালিশে-বিছানায় ওর শরীরের চাপে ডুবে যাওয়া শূন্য ছাঁচটা পড়ে থাকে। তাতে হেলান দিয়ে স্থমন্তর চোখের সামনেই পরপ্রেমিকের মতো রোদ শুয়ে থাকে। আজকের এই একলা তুপুরে সেই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়, স্থমন্ত বহু কাল জিনিয়ার পাশে শোয় না। তার ছাঁচের পাশে শোয়, তার ছাঁচ নিয়ে ঘর করে। জিনিয়া যেন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে, স্থমন্তর জন্যে রেখে যাচ্ছে তার বিগত ভালোবাসার ম্লান বিকেল। টাকার দরকার নিশ্চয়ই আছে। স্থমন্তর ওই সেলস-এ চাকরির মাইনে আর সামান্য কমিশনে কখনোই এ-পাড়ায় এইভাবে থাকা যেত না। সোমাকেই এত দামী স্কুলে দেওয়া যেত কিনা সন্দেহ। এ সবের পিছনেই জিনিয়ার হাত আছে অনেকখানি। জিনিয়ার হাত বড় বলে স্থমন্ত খানিকটা লজ্জা পায় ঠিকই। কিন্তু তার জন্যে তার কোনো রাগ নেই। সময়ে দরকারে অম্লানবদনে স্থমন্ত হাত পাততে পারে জিনিয়ার কাছে। জিনিয়া কিন্তু স্থমন্তর কাছে নিজের থেকে কোনোদিন

কিছু চায় না। হয়তো কৃপা করে তাকে এবং তার ক্ষীণ রোজগারকে। তাতেও সুমন্তর খুব একটা যায় আসে না। সুমন্ত জানে দুনিয়ার তাবৎ ভালো ভালো জিনিসগুলোর মতো বেশি টাকা বানাবার জন্যেও মানুষকে চড়া মূল্য দিতে হয়। সাধু-অসাধু যে-কোনো পথেই টাকা রোজগারের জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। নিজের আয়েস, কুঁড়েমির বিলাস, এ-সব জলাঞ্জলি দিতে হয়। ওইখানেই সুমন্তর আপত্তি। খালি মনে হয়, তা হলে যেন বেশি করে বাঁচা হবে না। জীবন তো মাত্র একটিবারই পাওয়া যায়। বড়লোক হওয়ার চেয়ে বড়লোকের নাতি হওয়া অনেক ভালো। ওর এই ধরনের নিস্পৃহতার জন্যেই হয়তো মাঝে মাঝে খামকা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে জিনিয়া। সামান্য কারণে খেপে যায়।

সোমার স্কুলের একটা মেয়ে নাকি একদিন কি একটা সাদা চকলেট এনেছিল। দারুণ খেতে। নিশ্চয়ই ইম্‌পোর্টেড ব্যাপার। সুমন্তর কাছে সোমা বায়না ধরেছিল ওই রকম চকলেট এনে দেবার। বই থেকে মুখ না তুলে খানিকটা আনমনাভাবেই সুমন্ত উত্তর দিয়েছিল, দ্যুৎ, ও সব বিদেশী চকলেট একদম বাজে। দোকানের সব কবেকার পুরনো স্টক। আমি তোমার জন্যে ভালো চকলেট এনে দেব। পুরনো কাগজ দিয়ে আয়না মুছতে মুছতে জিনিয়া হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ছিঃ, তুমি ওকে মিথ্যে কথা শেখাচ্ছ কেন। ইম্‌পোর্টেড চকলেট আমাদের চকলেটের থেকে ঢের ভালো খেতে। বল দাম বেশি, তোমার পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। ও সব বাজে কথা বলে কি লাভ। প্রথমটায় ঠিক কিছুই বুঝতে পারে না সুমন্ত। কারণ, সে কিছু ভেবে বলে নি। বইটা মুড়ে একটা অসহায় দৃষ্টিতে সে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে সোমার দিকে। এখন প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তবু মনে মনে একটা প্রশ্ন ছিল সুমন্তর। বাবার অক্ষমতাটা সন্তানের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার লাভ কতটুকু। ছোটবেলাতেই যে-সব ছেলেমেয়ে জীবনের সব সত্যিগুলো জেনে যায়, পরে তাদের কাছে জীবন যেন বড় শূন্য আর অসহ্য লাগে। আশ্রয় পাওয়ার মতো ছিঁটেফোঁটা অজানা কল্পনা থাকা ভালো। কোনো কথা না বলে শুধু জিনিয়ার দিকে একবার তাকায় সুমন্ত। তার বোবা দৃষ্টিটা যেন মিনতি জানায়ঃ তুমি তো এমন ছিলে না জিনিয়া। আমি তো কোনো ক্ষতি চাই নি তোমার।

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সুমন্ত। চারিদিকে সদ্য বিধবা দুপুর। যেন বড় বেশি শুব্ধ, নির্বিকার। অল্প হাওয়ায় বকুলগাছটা দুলছে। একটা

ষণ্ডামার্কা লোক বিরাট শব্দ করে নাক ঝেড়ে খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে গাছটার গায়ে আঙুল মুছে চলে গেল। হয়তো কলকাতার গাছেরা জন্মায় মানুষ এবং কুকুরের কাছ থেকে এই শ্রেণীর আদর পাবার জন্যেই। বড্ড শীত করছে। জানলা থেকে সরে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে সুমন্ত। জ্বালা ভরা লাল চোখ দুটো বন্ধ করতে মাথার মধ্যে বহুকাল আগের একটা টেলিফোন ফিরে আসে। বিয়ের প্রথম দিনগুলোর জিনিয়া। লম্বা গলায় সরু চেন দুলছে। আর সেই দীঘির মতো ভরাট কণ্ঠে—ওর পিসতুতো দিদি ইন্দ্রাণীকে বলছে, তোরা যেদিন এলি, আমরা সেদিন একটু মার্কেটিংয়ে গিয়েছিলাম। কিছু মনে করিস নি তো? দূর, পাগল নাকি, আমরাও তো এমনি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। কি কিনলি। জিনিয়া বেশ থেমে থেমে বলে, ওর স্লিপিং স্যুট, প্যান্টের কাপড, গেঞ্জি-রুমাল আর আমার জন্যে একটা সেন্ট। কিনতাম না সেন্টটা। তার পর ভাবলাম, কি আর হবে, শখ যখন হচ্ছে কিনলামই বা। আর ও তাতে খুশিই হবে। ইন্দ্রাণী বলল, ব্লাউজটা করতে দিয়েছিস? জিনিয়া উত্তর দিল, হ্যাঁ, সেদিনই তো দিয়েছি। সুমন্ত আবার সেদিন সঙ্গে ছিল। বলল, ব্লাউজটা খুব ছোট্ট বানাতে। অবাক-কণ্ঠে ইন্দ্রাণী জিগেস করল, তার মানে? আমি কি কাপড কম কিনেছি? হাসিতে ভেঙে পড়ে জিনিয়া বলল, আরে না না, তা কেন, আসলে সুমন্তর একটু ঝুলে ছোট ব্লাউজ পছন্দ কিনা—তাই। তা ছাড়া ওর আবার আমার জামার পেছনে বোতাম পছন্দ! আমি বললাম, বেশ বাবা তাই হবে…।

কথাগুলো যেন কে বলেছিল? জিনিয়া? আমার, মানে সুমন্তর বউ জিনিয়া? নাকি বেশি জ্বরের ঘোরে সুমন্ত সব বানাচ্ছে। সন্ধের পর জিনিয়া বাড়ি ফিরে যখন সুমন্তর কপালে হাত রেখেছিল, তখন বেহুঁশ চোখ খুলে সুমন্ত একবার সেই আগের জিনিয়াকে খুঁজতে চাইল। দেখল, সকালে যে সবুজ মাঠ ভেঙে, ঘাস-রঙ শাড়ি পরে জিনিয়া ফোন করতে এসেছিল, সেই মাঠ দিয়েই যেন ক্রমে লং-শট হয়ে সে ধীরে ধীরে প্রান্তবিন্দুতে মিলিয়ে গেল।

যান্ত্রিক গোলযোগ

ব্যাঙ্কের কাউন্টারে টোকেনটা হাতে পেয়ে সুমন্ত দেখল টাকা পাওয়ার লাইনটি বিরাট। এ লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা পেতে অন্তত ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। আজ সকালের কাগজেই কিংবা কালকের কাগজেও হতে পারে (কেন যে কিছুতেই খবরের তারিখ মনে পড়ে না !), যেন বেরিয়েছিল একদিনে অন্তত লাখ দুয়েক লোক পুজোর ছুটিতে কলকাতা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। একদিনে এক লাফে হনুমানেরা সব সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় চলে যাচ্ছে। সুমন্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভেবেছিল—যাক্, বাঁচা গেল, কলকাতাটা একটু ফাঁকা হবে। হায়রে এই কি তার নমুনা? পেতলের চাকতিটা হাতের মুঠোয় উলটোপালটা করতে করতে সুমন্তর মনে হল সে যেন একটা মহেঞ্জদড়োর প্রাচীন মুদ্রা পেয়ে গেছে। এখন কি এই ঘণ্টাখানেক সময় নিয়ে মাদ্রাজি কফির মতো ঢাল-ওপর করে ফেনা তুলব? একটু চা খেলে, মন্দ হত না।

পাশেই একটা আধা অন্ধকার পুরো কার্পেটে মোড়া ঠাণ্ডা খাদ্যশালা আছে। এক কাপ চা অন্তত খাওয়া যায়। কত টাকা আর হতে পারে। ভেতরে ঢুকেই চোখে পড়ল একটা কোণের টেবিলে দেবলীনা চ্যাটার্জি একটি সবুজ ভুট্টার মতো সুঠাম ছেলের গায়ে গা লাগিয়ে শুয়ারের স্যাণ্ডউইচে কামড় মারছে। ছেলেটি নিশ্চয়ই ওর স্বামী। ওদের দিকে পেছু ফিরে বসা যায় এমন একটা টেবিল বেছে সুমন্ত নিঃশব্দে নিজেকে সোফার উদার গতরে ছেড়ে দেয়। দেবলীনাকে দেখতে প্রায় আগের মতোই ছুঁচলো আছে। অন্তত একনজরে তাই মনে হল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ সুমন্তর সেইসব দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। ঠিক এই রকম অরেঞ্জ-পিকো চায়ের লিকারের মতো সে-সব সুগন্ধী স্মৃতি এতকাল যে কোথায় সটকে পড়েছিল। তখন দেবলীনা কারণে অকারণে প্রায়ই সুমন্তকে অফিসে ফোন করত।

সুমন্ত অতীতের তেমনি একটা কালো টেলিফোন কানে তুলে বলল, হ্যালো, এটা রং নাম্বার, আপনি ছেড়ে দিন।

দেবলীনা—রং নাম্বার তো কি? আসুন আজ এই মেঘলা দিনটায় বেশ জমিয়ে গল্প করা যাক।

সুমন্ত—ওঃ তা হলে তো খুব ভালোই হয়। কিন্তু আমি যে খুব বুড়ো হয়ে গেছি, আমার গল্প কি আপনার পছন্দ হবে?

দেবলীনা—যাক গে, আপনাকে আমি ইয়াং করে দেব—ঐ যে কি সব চক্রাবক্রা জামা আর বিরাট ফ্লেয়ার দেওয়া ট্রাউজার পরিয়ে, লম্বা জুলপি, অ্যাফরো চুল আর স্টিলের পেন্টাগন চশমা পরিয়ে···।

সুমন্ত—রক্ষে করুন, ঐ স্টিলের চশমা পরলে নাকের ডগাটা এমন ছিনে হয়ে যায় যে, মনে হয় কোনো দিন সর্দি ঝাড়ার সময় ফস্ করে নাকটা ঝরে পড়ে যাবে।

দেবলীনা—হি হি হি···।

সুমন্ত—বাদ দিন। আপনি কি করেন, স্কুলে কোন ক্লাশে পড়েন, কি নাম—এ-সব একটু বলুন না।

দেবলীনা—দেখুন মশাই আপনার গলাটা খুব সুন্দর, সেই ভাঙিয়ে আপনি রেডিওতে চান্স পেতে পারেন কিন্তু আমায় যা তা বললে মারব মাথায় এক গাঁট্টা। আমি মোটেই স্কুলে পড়ি না। আগে আপনি আপনার নাম বলুন, তার পরে আমি আমার নাম বলব।

সুমন্ত—আমার নাম রবীন চ্যাটার্জি।

দেবলীনা—বাঃ, বেশ নাম আপনার। ফোন নম্বর দেখে মনে হয় আপনার অফিসটা চৌরঙ্গী পাড়ায়, তাই না? লাঞ্চ করেন কোথায়, টিফ্যানিতে নিশ্চয়ই? আমি যখন লরেটো হাউসে পড়তাম, রোজ ওখানে খেতে যেতাম। যা সুন্দর সব স্ন্যাক্স বানায় না! আচ্ছা, আমি যদি আপনার সঙ্গে প্রেম করি, তা হলে আপনি আমায় ট্রিট্ করবেন তো? মানে এখানে ওখানে খাওয়াবেন···।

সুমন্ত—আপনি বুঝি খুব খেতে ভালোবাসেন?

দেবলীনা—ভী—ষ—ণ।

সুমন্ত—আমি কিন্তু একেবারে খেতে ভালোবাসি না। একটু মিষ্টি মিষ্টি রান্না আমার পছন্দ। ঝাল-ফাল আমার একদম ভালো লাগে না।

দেবলীনা—আমার কিন্তু ঝাল টক আচার এ-সব খেতেই বেশি ভালো লাগে, মিষ্টি খেতেই বরং পচা লাগে। আপনি কোন্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন?

সুমন্ত—পার্চেসে।

দেবলীনা—পাঃচেস? (খাঁটি ইংরিজি স্কুলে পড়া মেয়েদের মতো একদম

'র' উচ্চারণ না করে) এখানে কিন্তু অনেক ঘুষের টাকা পাওয়া যায়। আপনার নিশ্চয়ই অনেক টাকা? আমাকে কিছু টাকা ধার দিন না বাবা...।

সুমন্ত—আমার মোটেই টাকায় লোভ নেই।

দেবলীনা—তাই বুঝি? আমার কিন্তু (এখানে কিন্তু উচ্চারণ না করে) অনেক হাতে থাকলে খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে বিয়ে করি, আপনি কি তা হলে আমার ওপর বসিং করবেন? বরেদের বসিং আমার একটুও সহ্য হয় না...।

ভুম করে লাইনটা কেটে গেল। বয় বিল নিয়ে এসেছে। এইভাবে কোনো অদৃশ্য যান্ত্রিক গোলযোগেই কি দুটি অমন মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? শরীরটা যদি যান্ত্রিক হয়, তার সঙ্গে এক খাটে শুতে শুতে মনটাও একদিন যন্ত্র হয়ে যাবে। কিন্তু বিল-এর চেহারা দেখে তো চক্ষু ছানাবড়া। প্রায় সাত টাকা। মানে সাতশো পয়সা...মানে চোদ্দো শো আধ পয়সা...মানে ...মানে। এখানে চা-টা প্রায় তোলা হিসেবে সোনার মতোই দামী রাখতে হয়। নতুবা আরাম-কাঙাল ফেকলু পার্টিদের দূরে ঠেলে রাখা অসম্ভব। নিজেকে ফেকলু ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সুমন্তর মাথায় কী রকম একটা রাগ চিড়িক মারে।

আমাদের গন্ধেই যদি ধনবতীরা গর্ভিণী হয়ে যায়, তার থেকে আগলে রাখার জন্যেই যত টাকার পাঁচিল। ঢোকার সময় দারোয়ান বয় স্টুয়ার্ট থেকে সকলেই তাকে দেখে এমন মুখ-চাওয়াচায়ি করছিল যেন সুমন্ত ক্যালেণ্ডারের বিজ্ঞাপনে কোনো আধা উলঙ্গ ক্যাবারে গার্ল। ওঠবার সময় পকেটে হাত দিয়ে সেই মহেঞ্জদড়োর চাকতিটি অনুভব করতে গিয়ে সুমন্তর মাথা বোঁ বোঁ করে উঠল। রুমাল-দেশলাই-সিগারেট মায় দু-চারটে দাঁতখোঁটা কাঠি পর্যন্ত আছে, নেই শুধু সেই পেতলের চাকতিটা। হয়তো রুমাল তুলতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। কিন্তু কার্পেটের ওপর পড়ার শব্দ হয় নি। সুমন্ত টেবিলের তলায় হেঁট হয়ে ঘাড় গুঁজে ঝুঁকে হেলে অনেক কসরৎ করল। কাঁধের ধাক্কায় একবার পেয়ালা পিরিচের ঝন ঝন হতেই টেবিল-বয়টা ছুটে এল, ভাবল হয়তো ব্যাটা টাকা না দিয়ে অন্ধকারে টেবিলের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে কেটে পড়ার তালে আছে। সুমন্ত সিধে হয়ে বসে জলের কুঁজোর মতো গাম্ভীর্য নিয়ে একবার বেয়ারাটার মুখের দিকে তাকাল। তার পর শূন্য প্লেটের ওপর একখানা করকরে দশ টাকার নোট রেখে ফের তল্লাসি শুরু করল। অবশেষে টেবিলের ওপরেই মুখমোছা দোমড়ানো ন্যাপকিনটার তলা থেকে সেটা উদ্ধার হল।

চাকতিটা হাতে নিয়ে সুমন্তর মনে তখন সত্যিই ধ্বংসস্তূপের, তলা থেকে মহেঞ্জদড়োর মুদ্রা পাওয়ার উল্লাস। চেয়ার ঠেলে উঠতে গিয়ে একেবারে দেবলীনার মুখোমুখি। সেই দেবলীনা যে সব সময়েই হাসিখুশি, বাবারব্যাণ্ডের মতো টানটান স্মার্ট। নিজেকে প্রয়োজন মতো ছোট বড করে যে-কোনো অবস্থাব সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে। সেই দেবলীনা যাকে কেউ কখনো কাঁদতে দেখে নি।

শোন সুমন্ত, আমার স্বামী একটু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। তুমি আসবে একবাব আমাদের টেবিলে ?

খুব কাছ থেকে দেখে দেবলীনাকে সুমন্তর প্রথমেই মনে হল দেহের চূড়ায় চূড়ায় এখনো বঙ লেগে থাকলেও বয়সের মেঘ উঠেছে, স্তনের আড়ালে আবডালে ছায়া, ঘাতকের পদচিহ্ন। যতই অ্যান্টি-রিংকলস্ ক্রিম বেরুক, মানুষ তার চামড়াকে এখনো অবিকল টেরিন-লাইলন বানাতে পারে নি। সুমন্ত তাব কেশবেব মতো চুলে-ভাবি মাথাটা তুলিয়ে ওর নিজস্ব পুঁটি-চিকচিকে হাসি দিয়ে বল্ল, এতদিন পরে দেখা, একবাবও তো জিগেস করলে না, কেমন আছি—বা-রে নিজেই তো ভুলে গেছ। আমাদেব পিছু ফিবে বসেছিলে কেন মশাই ?

সাজানো রাগে ঠোঁট ফোলালেও দেবলীনার হাসিতে আগের মতোই চার হাজার সাতশো এগারো নম্বর য়্যু-ডি-কোলনের শুদ্ধি ছিল। দেবলীনাকে অনুসরণ কবে ওদের টেবিলে পৌছুতেই অমিত উঠে দাঁড়িয়ে সুমন্তকে স্বাগত জানাল।

অমিতের হাতে রোলেক্সের অবিজিন্যাল ব্রেসলেট, গায়ে প্রিন্টেড টেরিসিল্ক, গালের কয়েকটা মৃত ব্রণের গর্তে ব্রুট-আফটার সেভের সুঘ্রাণ—সব মিলিয়ে অমিত নিজেকে সভ্যতাব পুশ-বাটন ছাতাব মতো চকিতে মেলে ধবতে পারে। 'অশোক', 'অমিত', 'কল্যাণ' ইত্যাদি নামধারী মানুষগুলো ওটিস-লিফটেই বোধহয় জন্ম নেয়। তাদের ওপবতলায় ওঠা কেউ রুখতে পাবে না। সুমন্ত সর্টহ্যাণ্ডে মাথায় টুকে রাখল ছেলে হলে নাম রাখবে অশোককল্যাণ রায়চৌধুরী। অমিত হাসিতে ডানহিল সিগারেটের শুভ্রতা ছড়িয়ে বলল, লীনার মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। সেইজন্যেই আপনাকে দেখার খুবই ইচ্ছে ছিল। লীনা কিন্তু এখনো আপনাকে মিস্ করে।

দেবলীনা অমিতের হাতে আদুরে চিমটি দিয়ে বলে, আমি বুঝি তাই বলেছি ? আচ্ছা সুমন্ত তুমি কি সেই কটকের মেয়েটিকেই বিয়ে করেছ ?

একটা চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে যে-ভাবে গাছ, পোস্ট এবং স্টেশনের ছায়া সরে যায়, সেইভাবে দুটো ভয় একটা ভাবনা চারটে ভালোবাসাব কিছু সচল ছায়া সরে গেল সুমন্তর মুখের ওপর দিয়ে। দীঘির ওপার থেকে সুমন্তর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তার গলায় তখন ভরা শরৎ, তুমি কি সুনন্দার কথা বলছ লীনা? আমি তো বলেছি তোমায় ওকে বিয়ে করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

টেবিলের উপরে রাখা সুমন্তর সরু সরু লম্বাটে আঙুলের নখের ওপর কিউটেকস্ মাখাবার ভঙ্গিতে নিজের আঙুল বোলাতে বোলাতে দেবলীনা বলল, তুমি শুধু ওর নাম বলেছিলে, কিন্তু কোনোদিন তোমাদের সব কথা বল নি—

সুমন্তর ঠোঁটে আবার রোদ্দুরে মাছের ঝিলিক, অর্থাৎ তুমি আমার কাছে প্রেমের গল্প শুনতে চাও? কিন্তু আমার যে-সব মনেই নেই। তা ছাড়া সময় কোথা, একটুও সময় নেই আমার।

অমিত ইচ্ছে করেই সিগারেটের ধোঁয়ার নীল পর্দার ওপারে থাকতে চায়। দেবলীনা সুমন্তর দুধে-শসার মতো মিষ্টি চিবুকে হাত ছুঁইয়ে বলে, জানি বাবা, আজকাল তুমি মস্ত নামী কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। কলকাতা-জোড়া নাম। এখন আমাদের মতো মানুষের পাত্তা দেওয়ার সময় কোথা তোমার—

সুমন্তর চোখে গত রাতের বাসি-জুঁই লজ্জা, গলায় ক্ষমা এবং প্রশ্রয়ের মিলিত কক্‌টেল।

কথা দিলাম একদিন তোমাদের বাড়ি গিয়ে···এবার অমিত গলায় খানিক অনিশ্চিত দ্বিধা নিয়ে অনুরোধ করে, একদিন কেন, আজই সন্ধেবেলায় চলে আসুন না, যদি অবশ্য আপনার অন্য কোনো কাজ না থাকে—দেবলীনার চোখের ফ্যান-বেল্টে তখন সুমন্তর ডায়নামো দৃঢ়ভাবে বাঁধা। দেবলীনা তীক্ষ্ণভাবে দেখছে ফ্যান-বেল্টটা কোথাও আলগা হয়ে গেছে কিনা। আর সুমন্ত হাজার ভেবেও কিছুতেই থৈ পাচ্ছে না একটা ফ্যান-বেল্ট ছিঁড়ে যেতে কতদিন সময় লাগে। সুমন্ত হাওয়াদোলা পর্দার মতো আনমনা গলায় বলে, ঠিক আছে, আজই যাব। খুশি? দেবলীনার গলায় কম্পিত নারকেল পাতার চাপা ফিসফিস্—

আমার পা-ছুঁয়ে বলছ?

বাতাবি লেবুর খোসার মতো পাতলা মেঘে-ভরা শরতের আকাশ। শরৎ বৃষ্টি এবং আসন্ন শীত—সবই আছে আকাশে এবং সুমন্তর মনে। সুমন্ত যখন

দেবলীনাদের সি আই টি রোডের বাড়িতে পৌঁছুলো বাইরে তখন একটা চরিত্র-হীন হাওয়া। কপালে সবুজ টিপ, চোখে মাঠভরা আদিগন্ত জ্যোৎস্না নিয়ে দেবলীনা দরজা খুলে দিল। অমিত সামনের দোকানে গেছে কি সব টুকিটাকি কিনতে। এখুনি ফিরবে। ড্রইংরুমের সুসভ্যতা পেরিয়ে দেবলীনা ওকে সবুজ লনের আধা অন্ধকার বন্যতায় ডাক দিল।

দেবলীনার ঠোঁট বড় কাছে। যে ঠোঁটে এখনো ঠাণ্ডা নেবু-চায়ের রক্তাভ নিমন্ত্রণ। অমিত ফিরে এল বগলে কয়েকটা বীয়ার বোতল আর কাঁধ-উঁচু কিছু গেলাস নিয়ে। দেবলীনা অনুরোধ জানাল, তোমরা একটু বসবে? আমি স্যুটকেশটা খুলে চলে এসেছি। ওটা বন্ধ করেই এখুনি আসছি। আর দু-একটা টুকিটাকি যা তোলার আছে তা পরে তুললেই হবে।

হঠাৎ দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে চমকে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল অমিত। অগত্যা ভেতরে গিয়েই বসতে হল এবং স্যুটকেশ বন্ধ করে দেবলীনাও এসে বসল সুমন্তর পাশে। ভূমিকাহীন কোনো কবিতার বইয়ের মতো সুমন্ত তার ভারি কণ্ঠস্বর গ্লাস ভর্তি পানীয়ের মতো তুলে দিলো দু জনের হাতে।

তুমি তো জান লীনা আমি কটকে এক বছরও ছিলাম কি না সন্দেহ। তখন আর্টিস্ট হিসেবে আমাকে কেউ পুঁচতও না। অনামা একটা জুতোর কম্পানির সেলস্-এর কাজ নিয়ে হঠাৎ কটক চলে যাই। কোথায় থাকব কিছুই জানতাম না। শুধু নির্মল সেনগুপ্ত বলে আমাদের সঙ্গে কলেজে একটা ছেলে পড়ত যারা কটকের পুরনো বাসিন্দে বলে জানতাম। ভেবেছিলাম দু-চার দিন ওদের বাড়িতে থেকে পরে একটা জায়গা খুঁজে নেব। ভোর রাতে ট্রেন থেকে নেমে যখন সাইকেল রিকশায় উঠলাম আকাশে তখনো অনেক তারা জ্বলজ্বল করছে। বাতাসে নাম না জানা কি একটা ওড়িয়া আদিবাসী ফুলের গন্ধ।

নির্মল তখন পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। সবে ডাক্তারি পাস করে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। দুটো শোবার ঘর নিয়ে একটা ছোট্ট একতলা বাড়িতে ওদের দু জনের সংসার। দু জন মানে নির্মল আর নির্মলের বোন। ও তখনো বিয়ে করে নি। ওদের বসার ঘরেই একটা চৌকিতে আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সে ঘরে দু-একটা সস্তা কাঠের সোফা টেবিল ছাড়া পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে একটা পালিশহীন ঢাউস পিয়ানো ছিল। নির্মল পিয়ানো বাজাতে জানত না। বাজাত ওর বোন সুনন্দা। তাও আমি যাওয়ার পরে লজ্জায় ও বসার ঘরে ঢুকতই না। ফলে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত আমি জানতাম

পিয়ানোটা নেহাতই একটা ফালতু ব্যাপার। আমার সঙ্গে জানলার কাছে একটা হুকে সুনন্দার পোষা টিয়ার খাঁচা ঝুলত। রোজ সকালে খাঁচার দরজা খুলে দিত সুনন্দা আর পাখিটা হাঁটি হাঁটি পায়ে বাইরের বারান্দায় রাখা ওর বাটিতে চায়ের সঙ্গে পাউরুটি ডুবিয়ে খেত। একদিন সন্ধেবেলা বাড়িতে ঢোকার মুখে পিয়ানোর শব্দ শুনে আমি বারান্দায় থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। তার পর চুপিসারে উঁকি দিয়েছিলাম ভেতরে। বাইরের কম্পাউণ্ডে দু-একটা ইউক্যালিপটাস গাছের কাঁটায় গাঁথা এক টুকরো লাল টোম্যাটোর মতো আকাশ।

সুনন্দা লেখাপড়া মোটেই ভালবাসত না। একটু বেশি ছটফট আর খামখেয়ালী। বয়েসের তুলনায় বেশি ছেলেমানুষ। কলেজে কোনো রকমে দুটি বছর পার করে স্রেফ বাড়িতে বসেছিল। নির্মল ওকে নার্সিং-এর একটা কোর্স জোর করে করিয়েছিল। এখন দাদার সঙ্গে সুনন্দাও রোজ সকালে প্রাইভেট নার্সিং-এ বেরিয়ে যায়। ওর সঙ্গে আমার ভাব হল গল্প বলার সূত্রে। সুনন্দার ডাকনাম ছিল বিউ। আমায় প্রায়ই বলত যে বইটা পড়ছ তার ফ্যাক্টটা কি গো? কপট গাম্ভীর্য নিয়ে আমি বলতাম, ফ্যাক্ট জানতে হলে বইটা পড়ে নিলেই হয়।

বিউ বলত—আমার অত ধৈর্য নেই।

তা হলে এত গল্প শোনার ইচ্ছে কেন?

আমার রুগিকে রোজ একটা করে গল্প বলতে হয় যে। আমি ছাতামাতা অত গল্প কোথায় পাই বল তো!

বিউকে রাগিয়ে দেবার জন্যেই আমি বলতাম, কেন খবরের কাগজ থেকে গল্প বলতে পার।

বিউ গুলি গুলি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তার মানে? আমি বললাম সব খবরই তো গল্প, তাও জান না? আজকের খবর কালই গল্পের মতো শোনায়। যেমন ধর নীলকরের অত্যাচার, জমিদারের অত্যাচার, ব্রিটিশের অত্যাচার—এ-সব পড়তে আজ ঠিক গল্পের মতো লাগে না?

ওকে রোজ একটা গল্প বলা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাড়া পেতাম। এইভাবে ও যে কখন আমার খুব কাছে চলে এসেছিল বুঝতেই পারি নি। বুঝলাম, কটক ছেড়ে চলে আসার কিছু দিন আগে। কাজের ব্যাপারে আমাকে মাত্র এক-দিনের জন্যে ভুবনেশ্বর যেতে হয়েছিল। ওখানে অফিসের ছেলেটার পাল্লায় পড়ে একটু বেশি হৈ চৈ করে ফেলেছিলাম। একদিনের জায়গায় প্রায় তিন

দিন পরে কটকে ফিরলাম। সাদা খোলের উপর নীল ফুল ফুল একটা ছাপা শাড়ি পরে বিউ বারান্দার সিঁড়ির উপরেই বসেছিল। আমায় দেখে একটিও কথা বলল না। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে বসার ঘরের দরজা খুলে দিল। সারা মেঝে ধুলোয় ভর্তি। বিউ ঘরে ঢুকে তার পাখির দরজা খুলে দিয়ে ফের বারান্দার সিঁড়িতে এসে চুপচাপ বসে রইল। আমি তখনো ঘরে ঢুকি নি। দেখলাম, ধুলোর উপর পায়ের আঁচড় কেটে বিশ্রী কর্কশ একটা ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করতে করতে পাখিটা বেরিয়ে এসে বিউয়ের শাড়ির পড়ে-থাকা আঁচলটা ঠোঁটে করে টানাটানি করতে লাগল। পাখিটার চেহারা দেখে আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম। গায়ের সবুজ উঠে গিয়ে একটা পাঁশুটে ধূসর হয়ে গেছে আর গলার কাছে পালক ঝরে গিয়ে ভেতরের লাল মাংস দেখা যাচ্ছে। মনে হল পাখিটা গত তিন দিন খায় নি, হয়তো এ ঘরটা তিন দিন খোলাই হয় নি। বিউয়ের চোখে তখন এমন একটা আকাশ-পাতাল-পেরুনো দৃষ্টি যা কোনো স্বাভাবিক মানুষের থাকে না।

এই ঘটনার মাত্র ছ দিন পরেই আমি কটক ছেড়ে কলকাতা চলে আসি। এই ছ দিনে বিউ আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে নি। শুধু যাবার সময় ফিসফিস করে বলেছিল, তুমি জীবনে সুখী হবে না। আমি এই ধরনের অশিক্ষিত শাপ-শাপান্তে মোটেই বিশ্বাস করি না। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন অমিতবাবু বিউয়ের চোখের সেই নির্বিকার আকাশ-পাতাল-পেরুনো দৃষ্টি··· মেঝের ধুলোয় আঁচড় কেটে তিন দিন খেতে না-পাওয়া সাদাটে টিয়ার ট্যাঁ ট্যাঁ ···সিঁড়ির উপরে বিউয়ের নিথর বোবা হয়ে বসে থাকা—এই দৃশ্যগুলো আমাকে যেন সর্বক্ষণ তাড়া করে ফিরত। আমি ঘুমুতে পর্যন্ত পারতাম না। শেষমেষ নির্মলকে লিখেই দিলাম আমি সুনন্দাকে বিয়ে করব।

এতক্ষণ মাঝে মাঝে বীয়ার ঢালা আর সিগারেট ধরানো ছাড়া অমিত বা দেবলীনা টুঁ শব্দ করে নি। সুমন্ত থামতে দেবলীনা ওর হাতটা চেপে ধরে বলল, কি সুন্দর নাম 'বিউ'। আমি বিউকে দেখব—। সুমন্ত হাতের উলটো পিঠে একটা ছোট্ট হাই-চাপা গলায় বলল, বেশ তো, একদিন নিয়ে যাব।

অমিত চেয়ার টেনে দাঁড়িয়ে বীয়ার টলটলে চোখে বলল, একদিন-ট্যাকদিন নয়, আজই, এক্ষুণি যাব।

চলুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি সুমন্তবাবু। সুমন্ত একটা শক-খাওয়া মানুষের মতো তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। হঠাৎ কী রকম বেখাপ্পা কর্কশ

গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, আমার সঙ্গে ওসব ভদ্রতার কোনো দরকার নেই। কলকাতা শহরে এখনো যথেষ্ট ট্রামবাস চলছে।

খানিকটা মাতাল ভঙ্গিতে দরজা আগলে দেবলীনা বীয়ার-ঢালা তরল গলায় বলল, অত সোজা নয় মশাই, আজ যে করেই হোক আপনার বউকে আমরা দেখবই—।

হাত থেকে কাঁচের গেলাস পড়ে যাওয়ার ঝনঝন শব্দের মতো একটা অদ্ভুত হাসি হাসল সুমন্ত। তার পর খুব ধীরে চেয়ারে বসে অত্যন্ত কাটাকাটা ভাবে বলল, তোমরা কোনোদিনই বিউকে দেখতে পাবে না লীনা, কারণ বিউ বলে সত্যিকারের কেউ নেই। বিয়ে বা চাকরি কোনোটাই আমার মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না। শুধু পেটের দায়ে চাকরিটা না করলে নয় তাই। কিন্তু এ-সব বললে তুমি দুঃখ পাবে, তাই সুনন্দার নামটা স্রেফ বানিয়ে বলেছিলাম এবং ঘটনাটাও কটকে টেনে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

চেয়ারে বসা সুমন্তর পেছন থেকে দুটি কাঁধে জোরে চাপ দিয়ে দেবলীনা বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ সুমন্ত? বিউ সিঁড়ির উপর স্থিরভাবে তাকিয়ে বসে আছে, তার রোগা সাদাটে টিয়াপাখি, চারিদিকে ধুলো—এ-সব তুমি বানিয়ে বলেছ তা কি কখনো হতে পারে? তোমার আজ কি হয়েছে বল তো—

দু-বার মিস করে তৃতীয়বারে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুমন্ত তেমনি করাত দিয়ে কাঠ চেরা গলায় বলল, বিউ একটা বছর দশেকের মেয়ে, সে রোজ সকালে এসে নির্মল আর আমার জামা কাপড় কেচে দিয়ে যেত। টিয়াটা খেতে পায় নি, কারণ নির্মল আর আমি দু জনেই ভুলে ওটাকে তালাবন্ধ করে ভুবনেশ্বর বেড়াতে গিয়েছিলাম!

সুমন্তর কথা শেষ হতে না হতেই দেবলীনা ছুটে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ওর সেই পুঁটি-ঝিকঝিকে হাসি টেনে সুমন্ত অমিতকে জিগ্যেস করছিল, কি ব্যাপার লীনা অমন ছুটে বাথরুমে ঢুকে পড়ল কেন? এবার অমিতও হাসল, বলল, লাস্ট মিনিট প্যাকিং সেরে নিতে। কাল ভোরে বেরুতে হবে যে—

হতভম্ব সুমন্ত জিগ্যেস করল—বাথরুমে প্যাকিং? নিজের হাতের তাস মেলে ধরার ভঙ্গিতে অমিত বলল মিস অথবা মিসেস দেবলীনাকে আপনারা কেউ কখনো কাঁদতে দেখেন নি, তার কারণ ঐসব লাস্ট মিনিট প্যাকিংগুলো ও বাথরুমেই সেরে নেয়।

তারাপদ, তুমি আমার কাছে খানিকটা গন্ধ চেয়েছ। ব্যাপারটা আমার পক্ষে প্রায় রসিকতার মতো। ভাবলাম তারাপদ সবসময়ই যেমন মস্করা করে তেমনি হয়তো একটা কিছু। নিজেকে অন্যের ঠাট্টার খোরাক করতে তখনই বেশ লাগে যখন বুঝতে শিখি যে আমায় নিয়ে কয়েকজন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও প্রাণখুলে হাসতে পারবে। দুনিয়ায় প্রাণখুলে হাসার মতো বিষয় তো খুব বেশি নেই। তুমি যেমন সেই দিল্লীর পাঁইজীর গল্প বলেছিলে যার মাথায় শীতের সকালে ঝরঝর করে জল ঢালা হয়েছিল এবং যে রসিকতা সে নিজেও রীতিমতো উপভোগ করে হো হো করে হেসেছিল। আসলে আমার লেখা তো কোথাও কখনো ছাপা হয় নি, হয় না, হবে না। এহেন লেখাহীন লেখককে লেখা চাওয়া, ব্যাপারটা কি! না তারাপদ, আমি তোমার আন্তরিকতাকে ভেংচি কাটছি না। আসলে আমারই ঐসব অন্তর, আন্তরিকতা ইত্যাদি বস্তু বহুকাল লোপাট হয়ে গেছে। আমি যাকে বলে একটি আস্ত রাবড়িগচ্চর তা-ই হয়ে গেছি। নিচে আগুন আর উপরে বিনয়ের বাতাস—এইভাবেই ভেতরে রাবড়ির সর পুরু হচ্ছে। আমার ব্যবহারটাই আজকাল ঐরকম হয়ে গেছে। এক এক সময় এমন এক-একটা কাণ্ড করে ফেলি যার থেকে লোকে আমায় বেশ একটা বিনয়ী সজ্জন ব্যক্তি ভেবে নিতে পারে। এতেই আমার আতঙ্ক। আমি যা নই আমায় লোকে তা ভাববে কেন। ধরো, এক কাপ চা তোমাতে আমাতে ভাগাভাগি করে খেতে হবে। আমি ডিসটা নিয়ে, তোমায় দিলাম কাপের চা-টা। তুমি ধাঁ করে ভেবে নিতে পার, আহা! কি মহানুভব এই চৌধুরীর পো। আসলে আমি হয়তো কাপের তলা থেকে টুসিয়ে-পড়া চায়ের হাত থেকে জামা বাঁচাবার জন্যেই কাপটা নিলাম না। প্লেন ফিচলেমি এইসব ফিচেলদের পাঁচ মিনিটের জন্যেও কেন অন্যরা সাধু মনে করবে—এটাই আমার অহরহ বিরক্তির কারণ।

আসলে বিনয় ব্যাপারটার উপরেই আমি সব সময় তেলেবেগুনে। মনে হয় বিনয়টা সবসময়ই নানা কুকাজ ঢাকার মুখোশ। জীবনে বহুবার এদের চিনতে ভুল করে কত যে গাড্ডায় পড়েছি। কি একটা মার্কিনীদের পেছন-চাটা

বোম্বাই ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সিটগুলো বড্ড গায়ে গায়ে। আর চারিদিকে কড়া পেচ্ছাবের ঝাঁঝ। আমি বিরামের পর হলে ঢুকেছি। এক কাপ চা খাওয়ারও সময় পাই নি। খিদেয় পেট একেবারে চোঁ চোঁ করছে। হঠাৎ আমার নাকের কাছেই এক ঠোঙা ঝালমুড়ির গন্ধে ছবি দেখা মাথায় উঠে গেল। একদম পাশেই একটা মুটকি কলগেট-টুথপেস্ট টাইপের কোমর-ঘাড়-গলাহীন কুবেরদের মেয়ে ছবির তাজ্জব কাহিনীতে এমনই মশগুল যে মুড়ি খেতে ভুলে গেছি। আর তার কুস্তিগীর ধরনের বাহুলতা একটু বেশি কেলিয়ে রাখার দরুণ মুড়ির ঠোঙাটা একেবারে আমার নাকের ডগায় ঝুলছে। হাত সরিয়ে নিতে বলাটা ইতরামি। অথচ বিনয় দেখিয়ে চুপচাপ ক্ষুধার্ত নাকের সামনে ঝালমুড়ির ঠোঙা সহ্য করা আরেক ঝামেলা। এ ক্ষেত্রে ফট করে ঠোঙাটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মুড়ি খেতে শুরু করে দিলে, আমি ঠিক জানি, মেয়েটা টুঁ শব্দ করবে না। এমন কি অন্ধকারে ওর বুক খামচে দিলেও হয়তো প্রতিবাদ করবে না। বড়লোকের মেয়েগুলো আবার গণ্ডগোলে দারুণ ভয় পায়। (এ-সব ব্যাপার নাকি সিন্ ক্রিয়েট করা!) যাই হোক আমি দুইয়ের কিছুই না করে আলিস্যি ভাঙার অছিলায় জাস্ট একটু কনুই মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে পদতল মুড়ি মুখরিত। জুতোর তলায় মুড়মুড়ে মুড়ি মাড়ানোর স্বর্গসুখ উপভোগ করতে করতে একটা ছোট্ট 'আহা, সরি' ছুঁড়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে যেন গলায় তিনদিনের বাসি বীয়ারের তেতো উঠে এল। এমন ভ্যাবাচ্যাকা করুণ খোঁচা-খাওয়া আরশোলার মতো জটিল দৃষ্টি আমি সাতজন্মে দেখি নি। যেন মুড়ি ফসকে যাওয়াটা রাজধানী এক্সপ্রেস মিস করার মতো সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। ধ্যুত্তেরি, তার চেয়ে পনেরো নয়ার মুড়ি কিনে দিলেই শালার ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু মুড়ি কিনতে গিয়ে সেই যে হলের দুর্গন্ধ থেকে ছাড়া পেলাম তার পর আর ওমুখো হতে ইচ্ছা করল না। হয়তো মেয়েটার সত্যিই খিদে পেয়েছিল। হয়তো মেয়েটা অফিসের বি-গ্রেডে দশ বছর রগড়াচ্ছে, বাড়িতেও হয়তো গেরস্তঘরের পাঁচটার একটা। এহেন মহিলার সঙ্গে এমত ব্যবহার কি…। দূর হোক, বাস স্ট্যাণ্ডে প্রথম যে ভিখিরিটা এল, তাকেই মুড়ির দরুন পনেরো নয়া দান করে দিলাম। পাশের লোকে ভাবল আহা, কি মহানুভব…। আবার সেই সাধু সাজার ব্যাপার।

আমার নিয়ে ঠিক এই ভুল বিনু অর্থাৎ বিনতাও করেছিল। কতদিন থেকে যে বিনুকে মনে মনে পাবার কল্পনা করেছি। কত অসাধ্য সাধন করেছি ওর জন্যে। লম্বা পাঁচ বছর আমি কি শুধু শুধু ওর বুড়ো পঙ্গু বাবার পদসেবা

করার জন্যে যেতাম। জানি, উনি মানে জিতেনবাবু আমার বাবার বিশেষ বন্ধু। বাবা পাটনা থেকে বারবার লিখেছেন ওর খোঁজখবর নিতে। কিন্তু দুনিয়ার সব বুড়োরাই ভুলে যায় যে যৌবন নিমকহারামি করতে দারুণ ভালোবাসে। জীবনের চড়ার পাশে ঘুর ঘুর করতে চায় না, তার আশপাশ দিয়ে ছুটে পালাতে চায়। তবু প্রথম দিন জিতেনবাবুকে দেখতে যাওয়াটা আমি পবিত্র কাজ বা মনুষ্যত্বের কর্তব্য হিসেবেই নিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম দেখার কিছুই নেই। সেই একই ইতিহাস। সেই তেলচিটে বেডকভার, দাঁত ভেজাবার এনামেলের বাটি, মাথার কাছে শিবপুরের গুরুদেবের ছবি আর ওঁ-এর মধ্যে শ্রীকেষ্ট। সারাদিন জলের গভীরে তাকিয়ে থেকে ভর সন্ধেতে মাছ না পেয়ে ফিরে আসা অদ্ভুত বিষণ্ণ-গম্ভীর দৃষ্টি, যা প্রায় পৃথিবীর সব বৃদ্ধের চোখেই দেখা যায়, জিতেনবাবুর চোখেও তাই। কিন্তু বিনু না থাকলে কতকাল আর ঐ দৃষ্টির ভোঁতা ছুরিতে সময়ের খোসা ছাড়ানো যায়। নিজের ছেলে বিশ্বনাথ তো দিব্যি বাপের টাকায় ওষুধের দোকান করে কসবায় নিজের সংসার গুছিয়ে বসেছে। ন-মাসে ছ-মাসে একবার বাপের খোঁজ নিতে আসে কি আসে না। আর বিনুই বা কি। সারাদিন টো টো করে কোন চুলোয় যে পাক মেরে বেড়ায়। ব্যাপারটা সবাই বেশ জেনে গেছে। এটা হল প্রতীক্ষার সময়। জিতেনবাবু প্রতীক্ষা করছেন মৃত্যুর। এরা প্রতীক্ষায় আছে মৃত্যুর পর সম্পত্তি হাতড়াবার। আর আমার আকর্ষণ হল বিনু। সর্বত্রই যা হয় আর কি। প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম বিনুকে মুঠোয় পেয়ে যাব। কিন্তু শয়তান বিনুও যে আমায় ঠকাতে পারে ভাবি নি।···ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি ট্রেসিং পেপার আর কার্বন দিয়ে বিনুর টেবিলঢাকায় ফুলের নকশা তোলার চেষ্টা করেছি। আর সে কি যে সে চেষ্টা! পেন্সিলের শিস ভেঙে গেছে অথচ হাতের কাছে একটা ব্লেড বা ছুরি নেই। ভাঙা শিসটাই পেন্সিলের গর্তে ঢুকিয়ে ফের সাবধানে শুরু। ভুলে একটু বেশি চাপ পড়লেই আবার নড়বড়িয়ে শিস বেরিয়ে আসছে। পাখা চালালে পাছে কার্বন উড়ে যায় তাই জষ্ঠির প্রচণ্ড বলাৎকার সহ্য করে পাখা পর্যন্ত চালাই নি। আমার যখন এই রকম গলদঘর্ম প্রেমরোগ, বিনু তখন কোথায়। ঠিকই বুঝেছিলাম মেয়েটা ডুবে ডুবে অন্য কোথাও জল খাচ্ছে। তবে এটাও জানতাম যে ও কিছু না। আমাদের ক্ষতি করে বলে আমরা ছারপোকা টিপে মারি, মশা চাপড়ে মারি, আরশোলা জুতোয় চেপে মারি—এমনি আরো কত কি মারামারি করেই তো নিজের কাজ হাঁসিল করতে হয়। বিনুর প্রেমিককেও ঐভাবে সরিয়ে ফেলা

যায় ঝুম্ করে বিন্নুকে বিয়ে করে নিয়ে। শুধু ওর বাপকে হাত করতে যা দেরি। বিন্নু নিজেও হয়তো ব্যাপারটা আঁচ করেছিল। একদিন মুখের উপর জিগ্যেসই করে বসল আমি রোজ রোজ এখানে আসি কেন। ভাবলাম বলি, কেন আসি তুমি জান না, নেকু। আসি কি তোমার বাপের পুরনো অ্যাস ট্রে-তে জীবনের পোড়া ছাই ঘাঁটতে? মুখে বললাম, তোমার জন্যে।

জানলার মরচে ধরা শিকে হাত রেখে, বাইরে তাকিয়ে, একটা জঘন্য ময়লা ফেলা গলায় বলল, ওসব মতলব তোমায় ছাড়তে হবে। আমার ব্যবস্থা আগেই ঠিক হয়ে গেছে। আমি প্রায় ময়নার মতো নির্বোধ গলায় বললাম, ওসব পাড়াতুতো দাদাদের যতই চুম্ দিয়ে বেড়াও, তোমার সবটুকু পাব আমিই। আর কেউ না। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা বলার দরকার নেই। কথা যা বলার তা তোমার বাবার সঙ্গেই হবে।

আমি আর ওর উত্তর শোনার জন্যে দাঁড়াই নি। ভালোই জানতাম ওর বাবার অনেক কলকাঠি আমার হাতে। তা না হলে আর এতদিন ভ্যারেণ্ডা ভাজলাম কেন। তা ছাড়া আমাদের সেদিনের উলটোপালটা কথাবার্তার কিছু নিশ্চয়ই জিতেনবাবুর কানেও পৌঁছেছিল। তাই পরের দিন সন্ধেবেলায় আমি যখন জিতেনবাবুর বিছানার পাশে হাতলদেওয়া ভারি কাঠের চেয়ারটায় উপবেশন করলাম তখন বিনতারও ডাক পড়ল। নস্যির টিপ হাতে বিনতার দাদাও দেখি হাজির। বিনতাকে স্পষ্টই আমার কাছে ক্ষমা চাইতে হুকুম করা হল এবং আমায় জিগ্যেস করা হল আমি বিনতার ভার নিতে রাজি কিনা। এ তো প্রায় বাংলা সিনেমার মতো। এখানে নায়ক শুধু ভিলেন এই যা তফাত। একবার বিন্নুর মুখের দিকে তাকালাম। ছোটবেলায় একটা আসল চাঁদির চার আনাকে আমি পুকুরের গাঢ় সবুজ জলের মধ্যে ঝকঝকে রূপালী আলো তুলে খুব ধীরে ডুবে যেতে দেখেছিলাম। বিন্নুর চোখে তেমনি তলিয়ে যাওয়া আলো। সেদিন কোনো উত্তর না দিয়ে আমি প্রায় ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছিলাম। বিনতা হয়তো ভাবল আমি অত্যন্ত মহানুভব—কত বড় মুক্তিদাতা অবতার!

কিন্তু তুমি তারাপদ, আসল কথাটা জেনে রাখ। আমার সেদিন মুখভর্তি পান-জর্দার পিচ। এদিকে বিশ্বনাথের হাতের নস্যির গুঁড়োয় নাকে দ্রুত বড় হচ্ছে একটা দমকা বিকট হাঁচি। হেঁচে ফেললে ঘর বিছানা জামা কাপড় সব বিলকুল লাল হো যায়গা। এই অবস্থায় রাস্তায় ছুটে যাওয়া ছাড়া উপায় কি ছিল। অর্থাৎ হাঁচিই আমায় ঘাড় ধরে রাস্তা দেখিয়ে দিল, বিনয় না।

জেনে ফেলার ব্যাপার

আমি খুবই বোকাসোকা। তার জন্যে আমার কোনো রাগ-টাগ নেই। সবাই যা বলত আমিও তাই জানতাম। অর্থাৎ, আমি মানুষও হয়েছি ঐভাবেই। তবু মানুষ কী ভাবে মানুষ হয় এই রকম একটা ডুম ভাঙা ল্যাম্প পোস্টে ঠেস দিয়ে দাঁড়াবার আমার বড় সাধ ছিল। ভয়ে পারি নি। কারণ ল্যাম্প পোস্টের গায়ে কত লোক পিক ছেড়েছে, শিকনি, কত যুধিষ্ঠিরের বাদামি স্বর্গীয় কুকুর আচম্বিতে ঠ্যাং তুলে ফুচু করেছে। সবই কিন্তু ঐ ল্যাম্প পোস্টটিতে, যাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে আমার বড় সাধ ছিল। ভয়ে পারি নি। ভয়ের কারণ অনেক। তবু তার মধ্যে যেটা পরেশের দোকানে বাসি কেকের মাথার মতো। (হায়, সবাই কিন্তু মাথাই চায়, দইয়ের মাথা, কেকের মাথা, মানুষের মাথা, হুঁ হুঁ বাব্বা, মাথার একটা দাম আছে না?) ভাগে বাড়ে বলে পরেশ সেটাকে সর্বদা আড়াআড়িভাবেই কেটে থাকে। ফলে, সকলের পক্ষে মাথা পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। অথচ তাই নিয়ে খদ্দেরদের মধ্যে কি চেল্লাচিল্লি। পরেশ একদিন তাই অত্যন্ত কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিল, সকলেই যদি মাথা চান তো আমি কোথায় যাই বলুন তো। একটা কেকের কয়টা মাথা? আমার আসল বক্তব্য ছিল যে আমার বহুবিধ ভয়। সংস্কৃতে যার নাম বিবিধ্‌ভারতী ভয়। সেই ভয়সমূহের মাথাস্বরূপ যে ভয়, তার জন্ম অধিকার ভেদ থেকে। কি অধিকার আছে আমার মানুষ কী ভাবে মানুষ হয় নামধেয় ডুমহারা ল্যাম্প পোস্টে হেলান দেবার? কারণ, ১৬৬৪ সাল থেকে আমি শিখেছি যে আমি একজন নিরেট বোকা। আমার দ্বারা কিস্‌সু হবে না। ঐ সালটায় আবার টাটা-বিড়লা কেউ জন্মায় নি তো রে বাবা? থাক গে আরো শ-দুই বছর এদিক-ওদিক করে নিলেই ল্যাটা চুকে যায়।

আসলে যেদিন থেকে আমি জেনেছি যে আমি মোটেই সেয়ানা নই, সেদিন থেকেই আমি বোকা হবার কাজে উঠে পড়ে লেগে যাই। প্রায় হুমড়ি খেয়ে।

কারণ, তখন তো আমার জানা হয়ে গেছে যে আমার মাথায় কিচ্ছু নেই।

এই জানাটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার। বি-রাট। একবার কিছু জেনে ফেলার মতো শান্তি আর ভূভারতে নেই। কেউ জানে তার তুল্য বড়লোক নেই। কেউ জানে তার তুল্য লিখিয়ে নেই। কেউ জেনে ফেলেছে তার মতো অভিনয় ক্ষমতা বা সুর জ্ঞান আর কারই বা আছে। কেউ জানে সে সায়েবদের মতো ইংরিজি জ্ঞানী কেউ জানে সারা অফিসে তার মতো কাজের মানুষ নেই। কেউ জানে টেকনিক্যাল সাইডটা তার মতো আর কেই বা বোঝে? আরে যা যা, প্যাণ্ডেল সাজানো কাকে বলে ধিনিকেষ্টদের পাড়ায় দেখে আয়। এই শ্রেণীর সব মেজো-সেজো-ন-নতুন-রাঙা নানা সাইজের জেনে ফেলার একটা বি-রা-ট দাম আছে। নিজের সম্বন্ধে একবার কিছু জেনে ফেললে আর কোনো সমস্যাই নেই। তখন দুনিয়াকে থোড়াই কেয়ার, গরমেণ্টকে দুঃ-শালা আর পরীক্ষার হলে পেচ্ছাব করে দি। আসলে কিন্তু না জানা থেকেই যত দুঃখ কষ্ট। কথাটা খুব ছেঁদো। নিশ্চয়ই সাড়ে বাষট্টি হাজার বছর আগে-পরে কোপারনিকাস, শঙ্কর (রাচার্য) থেকে নীরদ চৌধুরীদের কেউ না কেউ বলেছেন অথবা বলব বলব করছেন নানা ছলে। এতে আমি কোনো ক্রেডিট নিচ্ছি না। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই বললেই হত, কিন্তু বাঙালির মুখে ক্রেডিট নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শুনি নি যে। তাই বোকার মতো ভাবলাম…।

যাক, যা বলছিলাম। না জানা থেকে যত দুঃখ। যে নিজেকে যে বিষয়ে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঠাউরেছে একবার তার সবজান্তা জামায় এক প্লেট চিকেনকারি ঢেলে দিলেই দেখবেন সব ভুলে সে কেবল কিল লাথি চড় ছুঁড়ছে। অর্থাৎ যে চিরকাল নিজেকে ঠিক যে-ভাবে জেনেছে, তার সেই জানার মূল স্থানে আমূল একটা লাথি মারলেই দেখবেন কত ধানে কত চাল। আমি একবার ঐরকম একটা অজ্ঞান লাথি ঝেড়েছিলাম কিনা তাই জানি। আর তাতেই আমার বিয়ে ভেঙে যায়। আর বিয়ে হয় নি। আমার সেই শ্বশুর হলেও হতে পারতেন ভদ্রলোকের রসিক হিসেবে পাড়ার খুব নামডাক। তিনি নিজেও জানতেন তাঁর কাছে কোথায় লাগে জহর রায় কিংবা চার্লি চ্যাপলিন। এও সেই জেনে ফেলার ব্যাপার। এক সন্ধেতে আমাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে গিয়েই উনি হাঁকলেন, কি গো পূর্ণিমাবালা, আমাদের জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে এর পরিচয় করিয়ে দাও। দরজার সামনে হয়তো চারটে নেড়িকুত্তা, পৌনে পাঁচটা বেড়াল এবং কিছু টিয়া জাতীয় পক্ষী থেকেও থাকবে। আমি অন্ধকারে অতশত লক্ষ্য করি নি। তা ছাড়া জন্তুটন্তু একদম অসহ্য। পারলে

ওদের সকলকে আমি শস্য আর লস্যি খাওয়াতাম। ভাবছি এবার ঐ আদরের জানোয়ারগুলো ঘরে ঢুকলে হবু জামাতা স্রেফ শাশুড়ির কোলে চেপে ট্যাংগো নাচবে। তার বদলে দেখলাম কালোর উপর লাল তাঁতের ডুরে পরা বছর আঠারোর একটা নাদুসনুদুস মেয়ে ঢুকল। এবং তার পেছু পেছু সেক্স বোঝা যায় না এমন রুগ্ন একটা শিশু মুখ। শেষেরটাকে কোলে তুলে বললেন, আমাদের জীবজন্তুর মধ্যে এটাই হল কনিষ্ঠতম। এর উপরে আরো দুটি আছে। দুটিই ছেলে। বর্তমানে কোথায় চরে বেড়াচ্ছেন জানি না। কথা শেষ হবার আগেই আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি দেখে ভদ্রলোক একদম হা হা করে ছুটে এলেন। বেচারী! বললাম, নিজের বাচ্চাদের জন্তুজানোয়ার বলে পরিচয় করানোটা কত বড় রসিকতা জানি না, কিন্তু আপনিও হয়তো জানেন না যে শুয়ারের বাচ্চার বাপও শুয়ারই হয়ে থাকে।

আগেই বলেছি যে নিজেকে নিরেট বোকা জেনে ফেলার পরেই আমি আরো প্রাণপণে বোকা হওয়ার কাজে লেগে যাই। আমার সেই লাগাতার বোকামির লম্বা ফিরিস্তি বাদ দিয়ে একটার কথাই আজ বার বার মনে আসছে। আমার কেরানি বাবা তাঁর নিজের কি-এক বদ খেয়ালে ছেলেবেলায় আমায় একটা বাক্স ক্যামেরা উপহার দিয়েছিলেন। আমি নানা ধান্ধায় কিছু কিছু পয়সা সরাতাম। গেরস্তের চাকর-বাকর বা সদ্য সিগরেটধরা ছেলেপুলেরা যা হামেশাই করে থাকে। এতে খুব একটা বুদ্ধির জরুরৎ নেই। বেশ কিছু জমলেই একটা ফিল্ম হয়ে যায়। তার পর স্রেফ ফটাফট ছবি তোলা। ছবি বলতে অবশ্য মেজমামু শিরদাঁড়া ফুলিয়ে বসে আছেন চিড়িয়াখানার রাজহাঁস, ভিক্টোরিয়ার সকাল, কিংবা লেকে সূর্যাস্ত ইত্যাদি মূল্যবান ছবি নয়। খুব শীত পড়েছে। না স্নান করে তখনো ঠাকুর ঘরে আসেন নি, শুধু তাঁর পুজোর আসনটার কাছে কী নোংরা গরীব একফালি পূজারিণী রোদ। অথবা রথের মেলায় শেয়ালদা থেকে একটা টবের স্থলপদ্ম গাছ কিনেছিলাম। গাছটা পরের বর্ষায় মাটিতে পোঁতার কথা। জানতাম গাছটা টবে বাঁচবেই না তার ফুল কিসের। আমাদের তো সদর দরজা খুললেই সিমেন্টের ফুটপাথ। জুতো-চটি জমিয়ে সকলে ক্রিকেট পেটাই। সুতরাং এক বছর পরেও গাছটার কোনো গতি করতে পারলাম না। অথচ রোদ জল খেয়ে গাছটা দিব্যি মাথাচাড়া দিয়েছে। বুঝি এত শেকড়বাকড় নিয়ে টবের মধ্যে আর কুলোবে না। কিন্তু কি বা করা। দেখতে দেখতে পাতা শুকিয়ে ইয়া তেজী গাছটা বেশ ঝিমিয়ে গেল। শেষে তিলে তিলে মৃত্যু দেখতে না পেরে ওটাকে টুপুদের বাগানে পুঁতে এলাম। পরদিন সকালে

নতুন মাটিতে হাত-পা খেলিয়ে বেঁচে থাকার যে হাসি দেখলাম গাছটায় তা সত্যিই ছবি তুলে রাখার মতো।

এই রকম সব এলেবেলে ছবি তুলতাম আমি। লুকিয়ে। কাউকে কখনোই ঠিক দেখাই নি। ফিল্ম ধুয়ে এলে প্রিন্টও করাতাম না। পয়সাই নেই। পুরোটা গুটিয়ে কৌটোর মধ্যে তুলে রাখতাম। যেমন করে লোকে তার বাক্সে নেশা-টেশা লুকিয়ে রাখে আর কি।

সেবার শীতে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে মধুপুর গেলাম। উঁচু ক্লাসের ছাত্র হিসেবে তখন যা যা ছিল বড় ছেলে হবার পতপতে বিজ্ঞাপন সেই ঘড়ি, কলম ইত্যাদি কিছুই নেই আমার। সম্বল ছিল শুধু সেই বাক্স ক্যামেরাটা। একা একা সেবার অনেক ছবি তুলেছিলাম। পুরো এক রিল। মানে বারোটা। মালির ছেলেটা ভারি রুগ্ন। ওর মা কিছুতেই ওকে গা-থেকে জামা খুলতে দিত না। একদিন ভোরে দেখি কেউ কোথাও নেই, ছেলেটা উদোম হয়ে ফাঁকা মাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ওর সারা গায়ে খুব দামী শিশির লেগে গেছে। হয়তো ওর শিশিরের জামা পরার খুব শখ ছিল। আমি লুকিয়ে ওর শিশিরের জামা-পরা ছবি তুললাম বেশ কিছু। সারা গা-মাথা একটা ছেঁড়া নীল কাঁথায় ঢাকা যে ছোট্ট মেয়েটা আমাদের রোজ দুধ দিত তাকে ঠিক খেয়াল করি নি। সে কিন্তু আমাদের রোজ মুরগির ডিম দিয়ে পাউরুটি খেতে দেখত। বলেছিলাম খাবি! লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গেল তার নীল মুখ। আকাশেরও আমি এই ধাঁচের লোভ-ধরা-পড়া লজ্জা দেখতে পেতাম। তাই প্রায়ই নীল আকাশের ছবি তুলতাম। মেয়েটার বাবার যখন শরীরে তেমন জুৎ নেই, ওর কাকা তখন বুড়োকে ঘর থেকে বাইরের দালানে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ কাকাটা ওর বাপের কাছেই মানুষ। মা আঁচলে চোখ মুছে বলতেন, ভগবান আছে, দেখিস ওর কখনো ভালো হবে না। অথচ মেয়েটার বাপ-মা শীতে কষ্টে ভিজে কাকের মতো একে একে মরে গেল। কাকাটা কিন্তু দিব্যি মজায় ওর বাবার ঘরে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে আর ওকে পাঠায় বাড়ি বাড়ি দুধ দিতে। মেয়েটার চোখে কেমন নির্ভগবান অন্ধকার। আমি ওর চোখের অন্তত কয়েকটি ছবি তুলতে পারতাম। কিন্তু তাতে ফিল্ম শেষ হয়ে যাবে, তাই মাত্র তিনটে। মেয়েটা বলেছিল সে কখনো ট্রাম দেখে নি।

মধুপুর থেকে ফেরার সময় ট্রেনে মাথার কাছে ক্যামেরাটা নিয়ে শুয়েছি। কে জানে কোন স্টেশনে জানলায় হাত গলিয়ে ওটাকে কেউ স্রেফ কেড়ে নিল। তাতে আমার সেই বারো-ছবির ফিল্মটা ছিল। আজ প্রায় বিশ

বছর পরেও আমি একটা খালি ফিল্মের কৌটো টানার মধ্যে গোপনে পুষে রেখেছি। হয়তো এটাই আমার শ্রেষ্ঠ বোকামি। এখনো রোজ বোকার মতো ভাবি আমার সেই করুণাময় ক্যামেরা চোর নিশ্চয়ই কোনো না কোনোদিন ফিল্মটা ডাকে ফেরত পাঠাবে যাতে আমার ছেলেবেলায় কি কি যেন সব ছবি ছিল—কত ছবি।

জন্মদাতা

খুব ছোটবেলায় কাদের যেন বাড়িতে একটা পাখি-ডাকা ঘড়ি দেখেছিল অসীম। ঘড়ির কপালে ছোট্ট একটা জানলা খুলে পাখিটা বেরিয়ে কু-কু করে সময় মাপত আর অদৃশ্য হয়ে যেত। সেই পাখিটা আজও যেন মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে প্রিয় স্মৃতির মতো ডেকে ওঠে। অসীম প্রায়ই ভাবে মা কেমন কত রঙিন স্মৃতি দিয়ে কত অনায়াসে সময় মাপেন, অথচ সে কেন পারে না। আমরা সেই যেবার মধুপুর বেড়াতে গেলাম, পারু তখন পাঁচ মাস পেটে, তুই সকালবেলায় খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে কপাল কেটেছিলি, কত আর তোর বয়স তখন বছর তিনেক হবে, সেই থেকে তোর কপালে ঐ দাগটা—। এইভাবে মা কেমন অনায়াসে বিশ বছর আগের মধুপুরের সকাল, পারুর বয়েস মাত্র পাঁচ মাস, আমার ভিম ইত্যাদি সব স্মৃতির ফিতেয় মেপে মেপে বলে দেন। হয়তো বুড়ো হলে মানুষ আর ঘড়ি দেখতে চায় না। সময়টা তখন তো আর ঘণ্টা-মিনিটের হাত ধরে চলে না, চলে বছরের হাত ধরে, যুগের হাত ধরে। একসঙ্গে অত সময় কোনো ঘড়িতে ধরে না, ক্যালেণ্ডারেও না। কিন্তু অসীমের এখন ছটফটানির বয়েস। ঘড়ি না হলে এক মিনিটও চলে না।

অথচ এখানে এতগুলো প্রাণী কিন্তু একটা ঘড়ি নেই কোথাও। ইন্দির-ছিন্দির বন্ধ ঘরটাতে তিনজনে শরীবের রাত-গন্ধে ভ্যাপসা বাতাস আর বাসি আলোয় বোঝা যায় না। বেলা কত। অসীম দরজার উপরের ঘুলঘুলি দিয়ে ঠাওর করতে চায় আকাশটা। পেটমোটা সিদ্ধিদাতাকে পেরিয়ে দৃষ্টিটা ঘুলঘুলির ঝুলকালিতে আটকে যায়। সেখান থেকে টুকরো আকাশটা দেখে মনে হয় এখনো চায়ের লিকারে দুধ পড়ে নি। বাবার বিয়ের একটা ডাবপারা ঘড়ি ছিল না। মা সেটাকে তাঁর ফুলশয্যার চেলির সঙ্গে তোরঙ্গে চালান করে দিয়েছেন। সেটা চাইতে গেলে সবাই তাকে বাবার বিয়ে দেখিয়ে ছাড়বে। অনেকেরই ধারণা জামা কাপড়ের মতো ঘড়ি ব্যাপারটাও বুঝি বেশি ব্যবহারে নষ্ট হয়ে যায়। ঘড়ি যে অব্যবহারেই বেশি নষ্ট হয় এটা বোঝাব কাকে। ওধার থেকে পায়ের খুটখুট শব্দে অসীম পিটপিট করে তাকায়। ভেতরের কল-ঘর থেকে বাটার রবারে মোড়া একটি চলমান শনিঠাকুর অর্থাৎ অসীমের বাবা

অম্বিকাবাবু ঘরে ঢুকলেন। বাইরের স্টার্টারে লাথি মারার মতো ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দুটো লাথি মারলেন পারুর ঘুমন্ত পিঠে। পাইপে তেল আসার মতো একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুলো মেয়েটার কণ্ঠনালি দিয়ে। ছোট হাতে আস্তে আস্তে চোখ কচলে উঠে বসল যে। কেরোসিনের শিশি থেকে তেল ঢেলে একটা ঘুঁটে ধরিয়ে তোলা উনুনে আঁচ দিল। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া আর কেরোসিনের গন্ধে বাতাস অসতী হল। অম্বিকাবাবুকে সাতসকালে টিউশিনিতে যেতে হয়। সুতরাং চা-টা তার আগে চাই। একটা পার্ট টাইম চাকরিও জুটিয়েছেন। ফিরেই আবার সেটা আছে। চিঠিপত্তর লেখার কাজ। ঘণ্টা দুই-তিন খাটলে যদি অন্তত দেড়শোটা টাকাও হাতে আসে তো মন্দ কি! বুড়োর এখনো যা হজমশক্তি আর চোখের জোর, মনে হয় আরো শ-খানেক বছর তুড়ি মেরে টিঁকে যাবে। দাদা বিমলও ভোরবেলা ফ্যাকৃট্রিতে বেরিয়ে যায়। সকালে বাড়ি থাকার মধ্যে শুধু মা, পারু আর অসীম।

ছোট আড়মোড়া ভেঙে অসীম বিছানা থেকে নেমে যায়। চায়ের ধান্দায় খানিকটা মায়ের কাছে ঘুরঘুরে করে। তার পর এক সময় চেরা শার্ট গলিয়ে সমীরদের ফটোর দোকানে চলে যায়। কলঘর খালি হতে এখনো অন্তত দেড় ঘণ্টা। তার আগে কেউ অসীমকে ঐ অঞ্চলে ঘেঁষতে দেবে না। এটা এখন প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ, সকলেরই নাকি কাজ তাড়া ইত্যাদি আছে। আর অসীম? ও তো বছর চারেক শুধু চাকরি খুঁজছে। বর্তমানে গোটা দুই-তিন ছিঁচকে-ছাঁচকা মাস্টারি। ওর আবার কি রাজকাজ আছে যে। যেন প্রাকৃতিক বেগ এসে যাওয়াটাও চাকরি করা না-করায় নির্ভর করছে। একবার হয়েও ছিল অসীমের। পেটের যন্ত্রণায় কপালের শির দপদপ করছে, জিভ শুকিয়ে কাঠ। অম্বিকাবাবু তাকে প্রায় ধমকে দাঁড় করিয়ে নিজে ঢুকে দরজার কুলুপ এঁটে দিলেন। তার পর বেগ দমন করাব আপ্রাণ চেষ্টায় অসীমেব দাঁতে দাঁত আর ঠোঁটে ঠোঁট টিপে মাথার চুল পযন্ত খাড়া হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে তবু দরজায় ধাক্কা দিতে হাত ওঠে নি। তখন শুধু বাহিরে থেকে সে মিনমিনে গলায় দু-একবার অত্যন্ত অচেনা শব্দের মতো বাবা শব্দটা উচ্চারণ করেছিল মাত্র। বদ্ধ কালা অম্বিকাবাবু হয় তা শুনতে পান নি, নতুবা শুনেও এড়িয়ে গেছেন।

ইচ্ছে করেই অসীম ফটোর দোকানের আড্ডা থেকে দেরিতে ফেরে। বেশিক্ষণ অন্তত শনি ঠাকুরের মুখোমুখি হতে হবে না। ফিরেই দেখে দাড়ি কামাবার ব্লেড খুঁজে না পেয়ে অম্বিকাবাবু তুলকালাম কাণ্ড জুড়েছেন। দেখতে

শুকনো খেঁকুরে ছোট্টখাট্ট হলে কি হবে মুখে একেবারে সাপের বিষদাঁত। এমনিতেও ছোট হাঁ মুখের তুলনায় অম্বিকাবাবুর দাঁতগুলো কেমন উলটো-পালটা, ফাঁক-ফাঁক আর একটু বেশি লম্বা। গায়ে পরিষ্কার সাদা হাতওলা গেঞ্জি আর ঠিক হাতার তলায় ডান হাতের তামার তাগাটা বড় হলহলে। রেগে গেলে যত হাত নাড়েন তাগাটাও তত কবজির দিকে নেমে আসে। অজান্তেই তখন আবার সেটাকে যথাস্থানে প্রেরণ করার জন্যে মাথার উপর হাত তুলে ঝটকা মারেন। এই রকম হাতের ব্যায়াম বার বার আপনা থেকেই চলতে থাকে। অসীম সেইসব সুসময়ে অম্বিকাবাবুর তাগার ওঠা-নামা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে, যাতে অনেক দামী এবং ভারি গালাগালগুলো ফুসফাস উড়ে যায়। কোনো অলৌকিক উপায়ে অসীমের অমনোযোগের ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে অম্বিকাবাবু আরো দাঁত খিঁচিয়ে ওঠেন, দামড়া হারামজাদাদের দাড়ি নয়তো যেন শুয়ারের লোম। দু দুটো ধেড়ে, একটা ব্লেড কেনার পযন্ত মুরোদ নেই। সেটাও বাপের ঘাড়ে···যত সব নুলোকুত্তার পাল জুটেছে···। ঐ শেষের মন্তব্যটাতেই কেমন যেন খুন চেপে যায় অসীমের মাথায়। চুলের ভেতরে ধকধক করে ওঠে রক্ত। দাঁতে দাঁত ঘষে চিৎকার করতে ইচ্ছা করে নুলো কুত্তার পালগুলো আপনি পয়দা হয় নি···। কিন্তু কি লাভ, যাকে বলা তার হয়তো কানেই পৌঁছুবে না, চিৎকারে মিথ্যে পাড়ার লোক জড় হবে। তার বদলে অসীম দেরাজের উপর পাতা কাগজের তলা থেকে একটা ব্লেড বের করে বাবার দিকে বাড়িয়ে দেয়। প্রাকৃতিক মানচিত্রের অসংখ্য নদী-নালার মতো অম্বিকাবাবুর শিরাবহুল হাতের উপর ব্লেডটা চালান করার সময় অসীমের একবার কুচকুচ করে পেঁয়াজকলি কাটার একটা ছুটন্ত ছবি চোখের উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, কারণ তার চোখে তখন নুলো নয় খাঁটি ডালকুত্তার চোখের আগুন দপদপ করছিল। অম্বিকাবাবু নির্বিকারভাবে তার সেই আদিকালের ভাঙা পাথরের টুকরোটায় বার আষ্টেক ব্লেডটার শান দিয়ে মাটিতে উবু হয়ে বসে কামাতে শুরু করলেন। অসীম সেই ফঁকে কাগজের আর এক গভীর ভাঁজ থেকে অন্য আর একটি চকচকে ব্লেড সরিয়ে দ্রুত কেটে পড়ল। এটার কথা সে দাদা বিমলকেও বলে নি। কারণ, কাল মালতীকে পড়াবার দিন। আজ ভালো ব্লেডে একটু চেপে কামালে কাল অবধি দিব্যি চলে যাবে।

একটু মেঘ মেঘ করে বৃষ্টি হতেই শীতটা আবার বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। দু দিন অন্ধকারের পর আজ নীল আকাশের ফুটফুটে আলোর তলায় সকাল

এগারোটার কলকাতা হালকা জুঁইতলার মতো তুলছে। পরনে বিজ্ঞাপনের নোংরা জিন্‌স্‌ নেই সভ্য রং করা দু-একটা সাদা ট্রাম ময়দানের সবুজ ঘাসের পাশ দিয়ে ডাগর রাজহাঁসের মতো মরাল গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। চৌরঙ্গির উপর লাল আলোর মুখে একটা থকথকে ভিড় রাস্তা পেরুবার অপেক্ষায় থেমে আছে। সামনে দিয়ে হু-হু শব্দে গাড়ি ছুটছে। ভিড় থেকে একটা শিশু হঠাৎ ছিটকে গিয়েছিল, তার মা তাকে ছাগলছানার মতো পিঠে থাবা মেরে ফের লাইনে টেনে নিল। রাস্তা পার হবার সময় ওপার থেকে আসা ভিড়ের স্রোতে অসীম একেবারে কল্যাণের মুখোমুখি। ময়দানের দিকেই গাড়ি পার্ক করেছিল কল্যাণ, এখন আবার ঐদিকেই ফিরে যাচ্ছে। অসীমকে এক রকম বগলদাবা করেই সে টেনে নিয়ে গেল গাড়ির কাছে। কল্যাণের গায়ে কী সুন্দর একটা হালকা রোদ-রঙের রোলকলার ব্যানলন, তার উপর চামড়ার কফি রঙের জ্যাকেট! অসীম দাদার সঙ্গে চুক্তি করেই রেখেছে এ মাসেই দু জনে শেয়ারে একটা গাঢ় নীল ক্রোম জ্যাকেট কিনবে। কিন্তু দাদাটা যা বিচ্ছু, হয়তো মালতীকে পড়াবার দিনেই সে নিজে ওটা পরে বেরিয়ে যাবে। গাড়িতে সামনের সিটে কল্যাণের চমৎকারিণী বউ বসে ছিল। পেছনের সিটটা খুব মোটাসোটা একগাদা ডানলপিলোয় ভর্তি। প্রাথমিক পরিচয় এবং দেঁতো হাসির পর গাড়িতে স্থানাভাবের জন্যে কল্যাণের শোক প্রকাশ ইত্যাদি। সেই প্রসঙ্গে বেমক্কা এই পেল্লাই ডানলপিলোর জন্যে কল্যাণের কত টাকা বেরিয়ে গেল তাও সে জানিয়ে দিতে ভুলল না। তখন অসীম শুধু হাঁদার মতো একটা প্রশ্ন তুলেছিল, এর তো একটু সরুও পাওয়া যায়, শুনেছি সেগুলোর নাকি এত দাম না? উত্তরটা কল্যাণের হয়ে ওর বউ কচি ডাবের শাঁসের মতো মোলায়েম গলায় দিয়েছিল, হ্যাঁ, কিন্তু এগুলোয় যা আরাম না, আপনি একবার বসলেই ফী-ই-ল করতে পারবেন। অসীম মনে মনে ভাবল হবেও বা। হয়তো এইসব সুগন্ধী মহিলাদের নিতম্বের অনুভব শক্তিটাও সাধারণ নিতম্বের চেয়ে কিছু বেশি। কে জানে! ওরা চা পানের একটা আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু আমাশায় ভোগা খেঁকুরে কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন সকালটাকে চিরে ফালি ফালি করে দিল আর মুহূর্তে অসীম চা-পান প্রস্তাবও নাকচ করে দিল। সময়মতো পেনশনের চেকটা ভাঙাতে না পারলে বুড়ো আজ তাকে স্রেফ জবাই করবে। তোর খেলাধুলোটা এখনো রেখেছিস নাকি, তোর নন্দিতাকে মনে পড়ে, সেই চালু অমরেশ নাকি এখন মেদিনীপুরের বি-ডি-ও। আর সেই নারকেলডাঙার খোকা রাজকুমার ভুপেন্দ্র নাকি এখন স্রেফ চারমিনার আর ভেলিগুড়ের চায়ের

উপর আছে? ইত্যাদি কলেজ জীবনের কবেকার পচা সব প্রশ্নোত্তর শেষ করার পর অসীম কল্যাণের কাঁধ টিপে বিদায় নিল। কল্যাণের কাঁধে হাত রাখার সময় অসীমের মনটা বেশ খুশি খুশি লাগল। কারণ, কল্যাণের থেকে সে অন্তত হাতখানেক লম্বা। নিচের বৃক্ষরাজির প্রতি সতত ক্ষমাশীল গড়ের-মাঠের মনুমেণ্টের মতো তার মনটাও কেমন সকলের প্রতি কৃপাসুন্দর সকাল হয়ে গেল।

ব্যাঙ্কে পৌঁছুতে বেলা প্রায় বারোটা। চেক জমা দিতে সেই পেতলের চাকতিটা তো খুব ঝট করে হাতে এল, কিন্তু টাকা তোলার কাউণ্টারে যা লক্কড় ভিড়! এখন চারিদিকে শুধু পাল পাল মানুষ। দম আটকে আসে। রাস্তাঘাট, ট্রাম-বাস, সিনেমা-থিয়েটার মায় পেচ্ছাবখানা পর্যন্ত কোনো ভাগাড়ে শালা এতটুকু নির্জনতা নেই। যেদিকে তাকাও শুধু অজস্র মুড়ো আর মুড়ো, নানা সাইজের মুড়ো। মুড়ো শব্দটা মনে আসার কারণ, ছোটবেলা থেকে মাছের ঐ বস্তুটা অসীম দু চক্ষে দেখতে পারে না। চোখ ভালো হবে বলে মা ছেলেবেলায় তাকে অনেক সময় চারাপোনার মুড়োটা জোর করে পাতে চাপাতেন। ওর দু আঙুলে ন্যাকা-চ্যাকার ভঙ্গি দেখে পাশ থেকে অম্বিকাবাবু খপ্ করে সেটা নিজের পাতে তুলে নিতেন। এবং ভেংচি কেটে বলতেন, আহা নবাব পুত্তুরের খাওয়ার যা ছিরি, খুব হয়েছে, আর চোখ ভালো করে কাজ নেই। ঘাড়-হেঁট অসীম অম্বিকাবাবুর দিকে না তাকিয়েও একটা ওৎপাতা হুলো বেড়ালকে অনুভবে পেত।

কাউণ্টারের সামনে লাইনের বহর দেখে হঠাৎ যেন নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগল অসীমের। অথচ ঠিক এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। তার মজবুত খেলোয়াড়ী দেহের গরম রক্তে এখনো বয়েসের কোনো সর পড়ে নি। ক্লান্তিটা নেহাতই সাময়িক। অনেক সময় চেনা মানুষের কথা শুনতেও ক্লান্তি লাগে··· কোনো শব্দ ভালো লাগে না···পৃথিবীতে কেন এত শব্দ। মনে হয় শব্দের ট্র্যাপিজ থেকে একটা বিশাল নিঃশব্দের মহাসমুদ্রে যদি মাথা নিচু আর ঠ্যাং উঁচু করে ডুবে থাকা যেত তো মন্দ হত না। অসীম নিজেকে ট্র্যাপিজ থেকে পেণ্ডুলামের মতো ঝুলন্ত প্রাণীরূপে দেখতে পায়।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে ফাঁকা আলো হাওয়ার ঝাপটায় কেমন যেন নেশা কাটে, নিজেকে ফের চাঙ্গা মনে হয়। এখুনি ঠিক বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। একটু এদিক-সেদিক ঘুরে বিকেলের টিউশানিটা সেরে একেবারে বাড়ি ফিরলেই ভালো। কি আর হবে। অপেক্ষা করতে করতে সেই অ্যামিবাইসিসের পোকাটার

মেজাজ একটু তিরিক্ষে হবে, তার পর অসীম ফিরলে গরগর খানিকটা—এর বেশি আর কি। একটু এলোমেলো ঘুরতেই অসীম তার মেজাজের হালকা আকাশটা পেয়ে গেল। ঠিক গলি নয়, একটা সরু রাস্তায় ঢুকেই এক তোফা দৃশ্য। একেই রাস্তাটা সরু, তায় দু পাশে গাড়ি পার্ক করা এবং একটা ঠেলা তেরছাভাবে গোঁজা। ঠিক উলটো দিকে কই ট্যাক্সির টায়ারে আড়াল করে এক সর্দারজী বসেছে পেচ্ছাব করতে। ফলে মধ্যে দিয়ে একটি গাড়ি যাওয়ারও পথ নেই। এ-হেন সময়ে অকুস্থলে এক ব্রা-হীন স্কিনি পরা আধুনিকা তার ফুটফুটে ফিয়েট ঢিলাইট ঢুকিয়ে পালাবার পথ পায় না। একটা আলতো হর্ন টিপতেও ভয়ে তার আঙুল কাঁপল বিদেশী অর্কিডের লজ্জার মতো। মিনিট দুই-তিন পরে জলযন্ত্রটি থলিস্থ করে সর্দারজী অল-ক্লিয়ার দিতে তবে গাড়ি নড়ল। একটা মুগ্ধ বোধ সাদা বাড়ির সামনে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অনেকখানি সবুজ লন। গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ঐ বিরাট লনে একটিমাত্র বেতের রকিং চেয়ারে বসে এক মুক্ত-নাভী নারী রাজকীয় নীল পশমে হয়তো তার নিজেরই নীলরক্তের ঘর তুলছে পরম নিশ্চিন্তে, একলাটি। শীতের লালচে রোদটা ঝকঝকে কলেজের ছাত্রীর মতো তার কাঁধে হাত রেখে হাসছে। এমনিতেই মেয়েদের নাভী দেখতে ভীষণ ভালোবাসে অসীম। শুধু সেইজন্যেই জিন্‌সের থেকে শাড়ির প্রতি তার আকর্ষণ বেশি। নাভির ঐ ছোট্ট গর্তটার মধ্যে এমন একটা নীরব রক-অ্যাণ্ড-রোল বাজে সারাক্ষণ যা মেয়েরা নিজেরা জানে না। এই সবুজ লন, সাদা বাড়ি, নীল উল, আর সোনালী নাভির নির্জনতা—সব মিলে দৃশ্যটা অসীমের মনে যেন গেঁথে যায়। বর্তমানে পয়সা দিয়ে মানুষ সবচেয়ে মূল্যবান যে জিনিসটা কিনতে পারে তার নাম সোনা বা হীরে নয়—নির্জনতা। নিজের সবুজ স্বাধীনতার ধুধু-লনে ঘেরা বাড়ি, কিংবা দূর কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যভরা দামী হোটেলে এইসব শৌখিন নির্জনতা বহু টাকায় কিনতে হয়। অসীমের হঠাৎ মনে হল বেশি টাকা থাকলে সত্যিই খুব ভালো হয়।

সন্ধের পর বাড়ি ফেরার জন্যে ট্রামের আশায় দাঁড়িয়েছিল অসীম। কিন্তু ট্রাম তো দূরের কথা এক-পা এগুবার উপায় নেই। বোম্বাই সিনেমা জগতের: কোনো-এক ঘরের শত্রু কলকাতায় এসেছেন, ফলে, মানুষের ভিড়ে সব যানবাহন বন্ধ। মজা হচ্ছে এইসব মানুষের কেউই কিন্তু লাখপতি না। দুধ বা রুটির জন্যে অন্ধকার থাকতে এরাও লাইন মেরেছে। কিন্তু তাই বলে কি সিনেমা বা ফুটবলে লাইন মারা বারণ। অনেকে এই অঙ্কটা মেলাতে পারে না বলে

মিথ্যে প্রচুর চেল্লাচিল্লি করে। খিদে অথবা শোক থাকলে ফুর্তি করা একেবারে বারণ—এ-রকম কি কোনো নিয়ম আছে?

দরজা দিয়ে ঢুকেই ডাইনে আলনাটার পাশে পুরনো তেলচিটে সেই নিজস্ব ক্যাম্বিসের সিংহাসন আলো করে বসেছিলেন শ্রীঅম্বিকামোহন চক্রবর্তী ওরফে শনিঠাকুর ওরফে জীবন্ত নিমিশের অমর জীবানু। অসীমকে ঢুকতে দেখে গরম তেলে তেজপাতা ছাড়ার মতো বললেন, এই যে বাবুর নৈশভ্রমণ শেষ হল? পা-টা টলছে না তো? ধরতে হবে নাকি?

অসীম উত্তর দেওয়া দরকার মনে করে না। পাশ পকেটে সিগারেটের প্যাকেটের গা থেকে দোমড়ানো টাকার খামটা আস্তে টেনে চেয়ারের হাতলে রেখে ভেতরে চলে যাচ্ছিল অসীম। পেছন থেকে ফের আর একটা চিৎকার, একটু অনুগ্রহ করে শুনে যান, আপনার পিসিমার খুব অসুখ। কাল বিকেলের দিকে একবার ওকে দেখতে যাব। বালিতে একা যাতায়াত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাত্তিরে চোখে ভালো দেখি না। তোমায় কাল আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মেঝের বিছানা থেকে পারুটা পিটপিট করে দেখছিল। অন্যদিন অসীমের সঙ্গে সে খানিকক্ষণ দাবার পার্টনার হয়। আজ দেরি হয়ে গেছে, ফলে অম্বিকা-বাবুর পুলিশী হুকুমে ঘুম পাক বা না পাক তাকে শুয়ে পড়তে হয়েছে। বিমল রোজ কারখানা থেকে ফিরেই খাওয়ার পাট চুকিয়ে নেয়, তার পর মোড়ে সুকুমারদের বাড়ি তাস খেলতে চলে যায়। আজ কিন্তু ভেতরের ঘরে দাদাকে বিছানায় বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করতে দেখে অসীম একটু অবাক হল। কত যুগ পরে যেন সে দাদাকে সুস্থিরভাবে বসে থাকতে দেখল। দাদা মানে বিমলকে হঠাৎ কী রকম 'লোক', 'লোক' মনে হল। কোথায় যেন দেখেছি লোকটাকে। খুব চেনা মুখও বেশিক্ষণ খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে কেমন অচেনা, পর পর হয়ে যায়। মায়ের ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বারান্দাটায় খানিকটা দাঁড়াল অসীম। বিশাল তিমি মাছের পেটের মতো শীতকালের জমাট ধোঁয়ার তলায় চেনা গলাটা কোথায় হারিয়ে গেছে। বিদ্যুৎ সংকটের জন্যে চারিদিকে একটা বেহিসেবী বাদামি অন্ধকার ভেসে আছে। ধোঁয়ার তলায় হারিয়ে যাওয়া পরিচিত গলিটার মতো মানুষের সঙ্গে পরিচয়টাও কেমন যেন মাঝে মাঝে ধোঁয়াটে মনে হয়। বাবা, মা, ভাই, বোন ইত্যাদি রক্তের আঠামাখানো কতকগুলো কেনা থাকলেই যে তারা নিজের হয় এ-কথা কে বলতে পারে। কালীদার চেম্বারে মাইক্রোস্কোপ দেখা অ্যামিবাইসিসের পোকাগুলো কিলবিল

করে। ছোটবেলা থেকে এই প্রশ্নটা সে বার বার ভেবেছে যে কি চায় মানুষটা। ছেলেমেয়ের কাছে কি তার দাবি। জীবনভর নিজেকে নিংড়ে নিংড়ে তেতো করেই বা কি লাভ। বালিতে পিসিমার বেল গাছে বেল হলে, কাঁচা বেল সেদ্ধ করে কি সুন্দর চাকা চাকা মোরব্বা বানাতেন পিসিমা। অসীম ভালোবাসে বলে টিফিনকৌটোয় ভরে পিসেকে দিয়ে অম্বিকাবাবুর অফিসে পাঠিয়ে দিতেন। কৌটো খুলে অসীম তার মধ্যে মাত্র দু-তিনটে চাকতি পেত। যদিও অসীম বেশ ভালোই জানে গোনাগুনতি তিন টুকরো মোরব্বা পাঠাবার মানুষ তার পিসিমা নন। অদৃশ্য কোনো শেয়াল-বাঁদরও কলকাতার অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ায় না। প্রমাণের দরকাব নেই, অসীম খুব ভালো করেই চেনে তার বাবাকে। কিছু জানার জন্যে প্রমাণটাই সব থেকে বড় কথা নয়। ভেতরে কতকগুলো গাঢ় রঙের অনুভব থাকে যা প্রমাণের থেকে অনেক সূক্ষ্ম এবং বেশি বিশ্বাসী। যারা তলে তলে লোভী, সুখী, হিংসুটে, ঘুষখোর তারাই কি তাদের ঐসব ধুলো-বালি ঢাকবার জন্যে উপরে উপরে খিটখিটে, বদরাগী আর নিষ্ঠুর হয়? কে জানে। সবই কেমন ধোঁয়াটে লাগে।···

ওদের দেখে আনন্দে পিসিমার এক চোখ জল! ছোট্ট জালের আলমারিটার মাথায় একটা শুকনো লাল আপেল ঘিরে এক টুকরো লালচে রোদ। তার পাশে পিশিমার মুখটা আরো বেশি ফ্যাকাসে আর সাদাটে লাগে। চিরকালের মুখচোরা পিসেমশাই তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত মিষ্টভাষী শালাটিকে যে কী ভাবে আদর-আত্তি করবেন ভেবে না পেয়ে থামকা চেয়ার-টেবিল টানাটানি করে এক হুলস্থূল বাধিয়ে ফেলেছেন। অসীম পিশিমার গালে হাত দিয়ে আদর করে। পিসিমাও তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বেতারে অভিমান পাঠান। উঠি উঠি করেও বেশ দেরি হয়ে যায়। চারিদিকে গ্রাম্য যুবতীর মতো একটা সুস্থ কামাতুর অন্ধকার' কলাবাগানটা ঝুপসি। বড় বড় গাঢ় সবুজ কলাপাতাগুলো অন্ধকারের ঘোমটায় জড়সড় কলাবউ। কিছু গাছের কলা, নারকোল আর পাটালিতে অসীমের দু হাত জোড়া, অম্বিকাবাবুর হাতে বেবিফুডের টিন ভর্তি বড় বড় সাদা মুড়ি। পাড়াটা পেরিয়ে ছোট এক চিলতে মাঠ। তার পরেই লেবেলক্রসিং। লেবেলক্রসিংয়ের ওপারে রিকশা নিয়ে স্টেশন পৌছুতে হয়। গলিটার দু-তিনটে দোকান পেরিয়ে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে পিশতুতো ভাই রবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফিরছে কলকাতা থেকে। হাতে ওষুধ, ধূপের প্যাকেট আরো কি সব যেন ছিল। অম্বিকাবাবুকে প্রণাম করতে কি খবর, কেমন টাইপের ক্রিয়াপদ শূন্য কিছু

টেঁকুর তুলে অম্বিকাবাবু এগিয়ে গেলেন। অসীম সিগারেট খাওয়ার এই মওকাটা ছাড়ল না। রবিটা প্রায় আগের মতোই আছে। টেরিকটের যুগে এখনো সস্তা নাইলন শার্ট পরে, গলার বোতাম দেয় গলার ব্যথার ভয়ে। চলনে বলনে এখনো মফস্বলের গন্ধ যায় নি। কথা বলতে বলতে এখনো থুতু ছেটকানো অভ্যাসটা যায় নি, আর চেঁচিয়ে হাসতে হাসতে তড়বড়িয়ে হাত টিপে ধরা ইত্যাদি সব আগেকার মতো। হাতের জিনিসগুলো পাশের রকে রেখে অসীম ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল এবং ট্রেনের দেরি হয়ে যাবার ভয়ে রবির কাছে বিদায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পাড়াটা পেরিয়ে মাঠে পৌছনো এক সিগারেট পথও না। ফলে, অসীম একটু ঢিমে হাঁটছিল আর ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছিল। কুয়াশা-মেশা খানিকটা আবছা চাঁদের আলো মাঠের উপরে দুধের সরের মতো থিতিয়ে আছে। সিগারেট শেষ করার জন্যে মাঠে গোলপোস্টের আড়ালে একটু দাঁড়াল অসীম। এক ঝাঁক মশা মাথার চুলের উপর বোঁ বোঁ করছে, পায়েও মশা ধরছে। ছোট থেকে মশা তাড়াবার জন্যেই বোধহয় পা নাচিয়ে নাচিয়ে পা-নাচানো অভ্যেস হয়ে গেছে। পড়বার সময় ঐরকম পা নাচানো দেখে অম্বিকাবাবু একবার স্কেল দিয়ে এক বাড়ি মেরেছিলেন হাঁটুতে। ভেতরের ঘরটা যতদিন পাওয়া যায় নি ততদিন সকলকেই মাটিতে শুতে হত। শুধু মা আর কচি পারু শুতো খাটে। অসীমকে বরাবরই খাটের তলা ঘেঁষে শুতে হতো, কারণ, গায়ে গা ঠেকলে অম্বিকাবাবুর ঘুম আসে না। খাটের তলা থেকে তখন ঝাঁক ঝাঁক মশা অসীমকে ছেঁকে ধরত তবে সারাদিন ফুটবল-ক্রিকেট নিয়ে দাপিয়ে বেড়ানো অসীমকে তখন পায় কে। বিছানায় শরীর ঢাকলেই মরা কাঠ। ফুলে ঢোল মশাগুলো নড়তে না পেরে অনেক সময় ঘুমন্ত শরীরের চাপে এখানে ওখানে মরে লেপটে থাকত। শালা, কিছু না হোক শুধু মশা টিপে রক্ত বার করার কল বানাতে পারলে একটা নতুন ব্লাড-ব্যাঙ্ক খোলা যেত। গরম সিগারেটের ছুঁচলো ডগা মুখ ফিরিয়ে দূরে তাকাতেই অসীমের রক্ত জল হয়ে গেল। অম্বিকাবাবু প্রায় রেল লাইনের কাছ বরাবর এগিয়ে গেছেন। দূরে একটা ফ্লাই সান্টিংয়ের পর একটা কাটা মালগাড়ি প্রায় নিঃশব্দে তখন লাইন ধরে এগিয়ে আসছে। বদ্ধ কালা অম্বিকাবাবু গাড়ির চাকার আওয়াজও শুনতে পাচ্ছেন না। মাঠের খানাখন্দ বাঁচাবার জন্যে উনি দিব্যি একমনে মাথা হেঁট করে গট গটিয়ে হাঁটছেন। আর দু-পাঁচ পা এগুলেই লাইন। লাইন পেরুবার আগে গাড়িটা এসে গেলে নিঃশব্দে একটি আকাট আমাশার পোকা খতম হবে

যাবে। কেমন একটা অবশ অনুভূতি পেয়ে বসে অসীমকে। সেই লোকটা—যে সাত সকালে চায়ের জন্যে লাথি মেরে পারুকে তোলে, সামান্য একটা ব্লেড দিতে পচা ডিমের মতো মুখ খারাপ করে, ছোট বাচ্চার মুখ থেকে মুড়োটা মোরাব্বাটা ঝেঁকে নেয়, নিজের ঘুম-সঙ্গমের সুবিধের জন্যে ছেলেকে খাটের তলায় ঠেলে দেয়, সেই কিলবিলে অ্যামিবাইসিসের পোকাটা আর মাত্র মিনিট তিনেকের মধ্যে দুনিয়া থেকে বিলকুল সাফ হয়ে যাবে। মাথার মধ্যে কেমন একটা অবুঝ গোঁয়ার রক্তস্রোত ঝলকে ওঠে। অত্যন্ত সংকটের সময় প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে একটা চোরা ফাউল করে বল কেড়ে স্রেফ গোলে ঝাড়ার মতো প্রবল বেঢপ গোঁয়ার্তুমি। লাথি খাওয়া ছেলেটার পেট টিপে কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ তখন চোখেই পড়ে না। ওসব যন্ত্রণা-ফন্ত্রণা, নীল মুখ—সব হাবিশ। তখন শুধু গোল চাই, জেতা চাই, সময় নাই…। যে-কোনো জয়ের মধ্যে এমন একটা জন্তু জন্তু মুখ থাকে যার কাছে ওসব দয়া-টয়া স্রেফ নিম্নাংগের চুল। সময় নেই…সময় নেই…। ফাঁকা মাঠে একটা দমফাটা চিৎকার করতে গিয়ে অসীম এক বুক গাড়ল ধোঁয়াশা টেনে চুপ মেরে যায়। লাভ নেই, মানুষটা কানে শোনে না। যত বড় দৌড়বীরই হোক এখন আর ছুটে ধরবারও সময় নেই। এক দুই তিন একটা ঠাণ্ডা কাঠবেড়ালী ঘাম শিরদাঁড়া বেয়ে তরতরিয়ে পাছার খাঁজে সেঁদিয়ে গেল। অসীম চোখ বন্ধ করে একটা ছোটার ভঙ্গি করল আর তখনই ব্যাপারটা কেমন গাঁটে গাঁটে ঝনঝনিয়ে উঠল। মনে হল কেমন যেন একটা বেশি রকম ইতরামি হয়ে যাচ্ছে। সুযোগ, মানে একটা চান্স, প্রতিপক্ষকে একটা চান্স দেওয়া তো উচিত। জীবন-ভর খেলাধুলো করে এইরকম একটা অখেলোয়াড়ী চোট্টামি? চারিদিক থেকে যেন লক্ষ গলায় শেম্, শেম্ আর থুতু। একটা আধলা ইঁটে হোঁচট খেয়ে মুহূর্তে ইঁটটা হাতে তুলে নিয়ে বুড়োর পায়ের গোছ লক্ষ্য করে অসীম যন্ত্র চালিতের মতো সেটা দ্রুত ছুঁড়ে দেয়। শালা, কত কালের ফিল্ডিংয়ের টিপ, যাবে কোথায়—দু কাঠি কেতরে বেল্ পড়ে গেল। অসীম অজান্তে একবার প্যাণ্টের পেছনে হাত মুছে ভাবল হাত-পা এখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। আচমকা পেছন থেকে পায়ে ইঁট খেয়ে বুড়োটা লাইনের স্লিপার বসানো পাথরের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে অসীম কাছাকাছি পৌঁছে যায়। বেবিফুডের ঢাকনা খুলে চাঁদের আলোয় একরাশ ফুলো ফুলো সাদা মুড়ি আর অম্বিকাবাবুর নাক কেটে, থুতনি কেটে ফোঁটা ফোঁটা লাল রক্ত। বুড়ো ঠিকই বুঝেছেন ইঁটটা অসীমেরই কীর্তি। রক্তাক্ত

ক্রোধে অপমানে যন্ত্রণায় সেই বৃদ্ধ কালা রাগী মানুষটা মাটি থেকে স্থিরভাবে একবার আদি শনির দৃষ্টিতে অসীমের দিকে তাকালেন। অসীম মুহূর্তে ঝুঁকে পড়ে বাবার লিকলিকে আলগা গলাটা জোর করে রেল লাইনের বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মূর্তিমান বুনো হাতির মতো নিঃশব্দে অন্ধকার বগিটা হুশ্‌ করে ক্রসিং পেরিয়ে চলে গেল। সেটার দিকে তাকিয়ে, এই অসহায় অন্ধকার মাঠে যন্ত্রণায় রক্তাক্ত অম্বিকাবাবু কি শেষ বয়েসে এই প্রথম অনুভব করলেন, যে অনেক সময় পুত্রও জন্ম দেয় পিতাকে ?

□